ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ছাত্রসংসদ

জাতীয় সেবা প্রকল্প

স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

কলেজের এন.সি.সি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী

সৃষ্টি

বার্ষিক পত্রিকা

একাদশ বর্ষ

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

তামাক বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন

নবীন বরণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন পর্বে
আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, কাইজার আহমেদ প্রমুখ

"LGBT" - বিষয়ক আলোচনা সভা

পাঠাগার গৃহ উদ্বোধনে সভাপতি,
পরিচালন সমিতি আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা

বাংলা বিভাগ আয়োজিত এক দিবসীয় রাজ্যস্তরের আলোচনা সভা

সৃষ্টি

SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - একাদশ

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - দশম

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ২০১৯

সভাপতি ঃ ড. বীরবিক্রম রায়
অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মন্ডলী ঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী ও
সাহীদ হাসান, তথাগত দাস
সদস্য মণ্ডলী ঃ ড. নিরুপম আচার্য, ড. মধুমিতা মজুমদার,
ড. পূর্বাশা ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা সাধু, ড. রজত দত্ত,
জগবন্ধু সরকার, সোমা রায়,লালমিয়া মোল্লা,
জাহাঙ্গীর সিরাজ, মোসা করিম,
মহঃ ওয়াসিম (ছাত্র প্রতিনিধি)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী, তথাগত দাস

প্রকাশক ঃ ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মুদ্রক ঃ রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার
ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

সূচি ঃ পৃষ্ঠা নং

সম্পাদকীয়- ৪
শুভেচ্ছা বার্তা - ৫
অধ্যক্ষের প্রতিবেদন - ড. বীরবিক্রম রায় ৬
হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে - মহঃ কুদ্দুস আলি ৭
সাংস্কৃতিক সম্পাদক - প্রতিবেদন ৮
ক্রীড়া সম্পাদক - প্রতিবেদন ৮

প্রবন্ধ ঃ-

THE RELEVANCE OF KALIDASA'S CONCEPT OF ENVIRONMENT AWARNESS IN THE PRESENT CHALLENGING CRISIS
- Prof. Paromita Biswas (Department of Sanskrit) ৯ - ১০

শিকড় ।। নাটিকা ।। - বীরবিক্রম রায় ১১ - ১৩
প্রাক্তন - অনুপম ঢালী, ভূগোল (অনার্স) প্রথম বর্ষ ১৪ - ১৫
নারীবাদী সচেতনতা - প্রিয়াঙ্কা নস্কর, বাংলা (অনার্স) প্রথম বর্ষ ১৬
গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর - সৌরভ মন্ডল, বাংলা (অনার্স) প্রথম বর্ষ ১৭ - ১৮
রতনের গল্প - সেলিমা খাতুন, ইংরেজি (অনার্স) প্রথম বর্ষ ১৯ - ২০
সাগরের ঢেউয়ে ভেসে রইল মানবিকতা -
জাহিরুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স) প্রথম বর্ষ ২১ - ২১
এক বিংশ শতাব্দীর ভারত - রাহুল সরদার, এডুকেশান (অনার্স) প্রথম বর্ষ ২৩ - ২৪
সবার আড়ালে মা - মুনমুন রায়, সংস্কৃত (অনার্স) প্রথম বর্ষ ২৫
আত্মহত্যার পিপাসা - সুমন পাল, বাংলা (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ ২৬ - ২৮
ভ্রমণে অদ্ভুত ভূত - আবুল ফারাক মোল্যা, ভূগোল (অনার্স) প্রথম বর্ষ ২৯ - ৩০
কালবৈশাখী ঝড়ের সেই রাত - সাব্বির মোল্যা, প্রথম বর্ষ ৩১ - ৩২
রহস্যময়, ভয়ঙ্কর, মায়াবী ও আত্মহত্যার জঙ্গল ঃ অওকিগাহারা -
মহিবার রহমান (কম্পিউটার পারসোনাল) ৩৩ - ৩৪

কবিতা ঃ ৩৫ - ৪৯
সুজয় পাল, মোঃ সাহিন আলম, জেসমিন নাহার পারভীন, ইনজামুল হক গাইন, ফারাহানা পারভীন, সৌরভ ঘোষ, সুব্রত সরদার, গৌতম বিশ্বাস, জিসান মোল্যা, কবির আলি মোল্যা, প্রভাস দাস, পম্পা গাইন, মহিমা খাতুন, কোয়েল সরদার, নাসিম ইকবাল, কবির আলি মোল্যা, সুমন পাল, সঞ্জিতা সরদার, পল্লবী মন্ডল, রোহিনী পারভীন, দিলবার হোসেন, মহিমা খাতুন, রোহিনী পারভীন, খাদিজা খাতুন, মধুমিতা নস্কর।

চিত্র ঃ-রীনা ইয়াসমিন, সাহানি পারভীন, পায়েল মন্ডল ৫০ - ৫২

সম্পাদকীয়

সৃষ্টির একাদশ তম সংখ্যা প্রকাশিত হল। কুঁড়ি থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার পথে 'সৃষ্টি' চলেছে। এই সময়ে সৃষ্টির প্রয়োজন পাঠকের সহযোগিতা - যা চাই সৃষ্টির প্রতিটি পাঠকের কাছ থেকে। তা হতে পারে সমালোচনা রূপেও। আমরা তা মাথা পেতে নেব। পাঠকের ভালবাসা, সমালোচনা, প্রশংসাই তো সৃষ্টিকে আরো বড় হতে সাহায্য করবে। 'সৃষ্টি' এখনো তার শৈশবের গন্ডী পেরোয় নি। তাই তার ভুলকেও হয়তো ক্ষমা করা যায়। এই আশা রাখি। সৃষ্টি যেন ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি পত্রিকায় পরিণত হতে পারে সেই আর্শীবাদ চাইছি সবার কাছ থেকে।

BHANGAR MAHAVIDYALAYA

P.O. & P.S.-Bhangar, Dist.-South 24 Parganas, West Bengal, Pin-743502

AFFILIATED TO THE UNIVERSITY OF CALCUTTA (C.U.)

&

RE-ACCREDITED TO NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL (NAAC)

Phone & Fax : (03218) 270460

Email : bmv.college@gmail.com

Website : www.bhangarmahavidyalaya.in

ESTD.- 1997

Ref. No...............................

Date..............................

sage from the President, Governing Body, Bhangar Mahavidyalaya

It gives me great pleasure that the College is going to publish its annual Magazine *SRISHTI* for the academic year 2019-20.

I am sure that the College Magazine will provide budding poets and litterateurs the scope to cultivate their talent. That the Teaching and Non-Teaching Staff of the College lend their helping hand to the timely publication of the Magazine is all the more encouraging.

I wish them all the very best.

Abdur Razzak Molla

President

Governing Body

Bhangar Mahavidyalaya

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশিত হতে চলেছে। নজরুল লিখেছিলেন - "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে / মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর / টগবগিয়ে খুন হাসে...।" আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবংবিধ উল্লাসে প্রতিবছরই তাদের এই পত্রিকা প্রকাশ করে। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও তাদের সুরে সুর মেলান। তাঁদের ব্যস্ত কলম যতো বেশী করে 'সৃষ্টি'র পাতায় ফুল ফোটাবে ছাত্রছাত্রীরা ততোই উৎসাহ পাবে। কেবল একটি আবেদন, 'সৃষ্টি' একটু সময়মতো প্রকাশিত হোক।

ধন্যবাদান্তে -

ডঃ বীরবিক্রম রায়

অধ্যক্ষ

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

।। হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে।।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশের পথে। শুভেচ্ছা রইল। ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্লাটফর্ম কে ব্যবহার করুক। নতুন নতুন সৃষ্টি কর্মে মেতে উঠুক এই আশা রাখি।

মোঃ কুদ্দুস আলি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

২০১৯ সালে বার্ষিক পত্রিকা সৃষ্টি প্রকাশের পথে।
এই সাধু উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।
এই প্রকাশের মুহূর্তে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

অমিত কুমার মন্ডল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ছাত্রসংসদ

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম আশা করি 'সৃষ্টি' পত্রিকা আমাদের কলেজের সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে নব সৃষ্টির বার্তা। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের কোণে কোণে, সৃষ্টি হোক আরো নতুন সাহিত্য প্রতিভার। এই পত্রিকার সার্বাঙ্গীন কুশল ও বিকাশ কামনা করি।

—মহঃ নাজমুল হোসেন

THE RELEVANCE OF KALIDASA'S CONCEPT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS IN THE PRESENT CHALLENGING CRISIS

Department of Sanskrit - Paromita Biswas

The term 'Environment' refers to the things around the organism (living beings), which have a direct influence on the activities of the organism. Organism and the environmet are the two factors which may not be bifurcated from each other. The organisms depend upon their environment for their sustenance, while the environment provides them base or medium for various activities of their life. The relationship between organisms and the environment therefore, is of reciprocal nature. Environment includes physical or non-living or abiotic things, and the biotic or living environment.

The word 'Environment' is derived from the French word 'Environ' which means 'surrounding'. Our surrounding includes biotic factors like human beings, plants, animals, microbs etc and abiotic factors such as light, air, water, soil etc.

Environment is a complex of many things, which surround man as well as all other living organisms. Environment includes water, air and land and inter-relationships which exist among and air, water, land and human-beings and other living creatures such as plants, animals and micro organisms.

The natural environment consists of four inter linking systems namely, the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere and the biosphere. These four systems are in constant changing process and such changes are affected by human activities.

Human beings and other Environmental things are closely inter-related and inter-dependent as the two sides of the same coin. The human beings flourish in its lap and at the end take eternal rest therein. In the vast field of Sanskrit literature, beginning from the Vedic up to Classical, environment plays significant role on human civilization.

Kalidasa, the great poet dramatist occupies a dominant place in the field of Sanskrit literature. Kalidasa's awareness for environment revealed in his treatment of nature in his works unique, magestic and significant one through which he earns the worldwide recognition as 'The Poet of Nature'. Hence, the present research work is a humble attempt to examine the different aspects of environment awareness reflected in the famous works of Kalidasa and its relevance in the present challenging crisis.

Kalidasa, in his all works portrays nature in a most appreciating manner. The universal relationship between Nature and Human beings, where human being is nothing but an element of nature is much relevant in the present country.

Kalidasa always emphasizes on a pure mind for a conductive environment which has relevance in the present psycho ecological scenario of the global era. It is a fact that maximum environmental hazards which are faced by mordern society occure due to wrong human activities. Various types of pollutions in air, water, soil defilement etc are spolling the mordern civilized society to live in this planet. But in Kalidasa, we have adequate morals to reduce these problems.

The topic regarding the protection of wild life draws serious attention among the environmentalists of the present era. In the works of Kalidasa also we have innumerable moral lessons relevance of which may play as a nodal approach in solving this problem. According to Kalidasa, man should avoid violence. He should get rid of the negative feelings such as anger, malice, desire etc. One should understand one's .his duty properly towards these wild creatures.

Thus, it can be said that the works of Kalidasa had the grass root level information along with its practical utilization for eco-friendly life support system. Kalidasa's works are full of techniques, methods, principles and philosophy of saving human beings from the horrible impact of environmental pollution.

Kalidasa perfectly realized this fact that for a fair environment both the animate and inanimate things should have equal importance. Kalidasa, the great poet was well aware of the fact that trees and plants which are the major components of the environment, plays a vital role in maintainng ecological balance.

Through his all works, Kalidasa imposed restrictions on killing animals. He established well the fact that in a peaceful environment even the fierce animals forget their violent nature if the human being maintain an eco-friendly, fellow feeling behaviour with the other.

It is an undeniable fact that, in the present century human beings enjoy maximum comfort in daily life, through the advancement of science and technology. On the other hand, the degradation of nature and environment is also alarming. He portrays an intimate and cordial relationship between man and nature and here lies the uniqueness of Kalidasa which is very much relevant today. He is not only the great poet, but also an environmentalist too. If the present so called developed human civilization follows the great morals regarding man-nature relationship as maintained by the great poet Kalidasa, will surely help to over come the threats of environment and may lead the human being to live in a conductive, eco-friendly, pollution free world.

।। শিকড় ।। ।। নাটিকা ।।

বীরবিক্রম রায়

(মোবাইল ফোনে আমেরিকা প্রবাসী নাতনি আর এদেশে থাকা বাঙাল ভাষা বলা ঠাকুমার কথোপকথন)

নাতনি - হ্যালো ঠাম্মা, হ্যালো। হ্যালো... আমি ইরা বলছি পেনস্টেট থেকে...।

ঠাম্মা - হ, হ, বুঝছি... তুই আমাগো বুড়ি ... আর পেন পেন্সিল অতো শতো বুঝি না বাপু। তা... এই সাতদিনে আমারে মনে পড়ল না রে বুড়ি? (গলায় ক্ষোভ)

নাতনি - না গো ঠাম্মা। জানোই তো ISD কতো Costly ... তাও তো আমি মাম্মিকে লুকিয়ে ফোন করছি। তোমায় তো বলেছি একটা ল্যাপটপ কিনে নাও আর তাতে Skype লাগিয়ে নাও ! Log in করবে আর কথা বলবে। তোমার চোখের সামনে আমাদের ছবি চলে আসবে ! তারপর যতো ইচ্ছা গল্প করো।

ঠাম্মা - এই বয়সে তোমাগো টপস্ না কি বলে তাই পইর‍্যা লগি হাতে লইয়া আমি কি করুম?

নাতনি - ও ঠাম্মা তুমি না সেই ঠাকুরমার ঝুলির সময়েই রয়ে গেলে। টপস্ না ল্যাপটপ... কম্পিউটার। আর লগি না Log in তাও ভালো Cell phone টা ঠিকঠাক ধরতে পারছো। আগে তো Call এলে ধরতে গিয়ে কেটে দিতে।

ঠাম্মা - আমাগো সময় এসব আছিল না রে বুড়ি। খবর লওনের জন্য ফুন (Phone) লাগদো না। একবার মাইধ্যমিক পরীক্ষার আগে তর বাপে লুকাইয়া লুকাইয়া সিনেমা হলে গিয়া সিনেমা দ্যাখতাসিল। ঠিক্ হারু দেওরের চখে পড়সে। কানে ধইর‍্যা হারু দেওর তর বাপের বাড়িত দিয়া গেসিল। আমারে কয় (হাসতে হাসতে) পরীক্ষা যদি না থাকতো তাইলে পটার মাথায় গাঁট্টা মাইর‍্যা আলু কইর‍্যা দিতাম। পরীক্ষার পর হারু দেওরই ওরে নিজে গিয়া সিনেমা দেখায়ে আনছিল।

নাতনি - (সহাস্যে) আরে ঠাম্মা, এতোদিন তো বলোনি Daddy'র Pet name ছিল পটা?

ঠাম্মা - (সভয়ে) কইস না বুড়ি ! আমারে এক্কেরে খাইয়া ফালাইবো। মুখ ফসকাইয়া বাইর হইয়া গ্যাসে। কইস না.. ওরে।

নাতনি - কেন ঠাম্মা, Daddy রেগে যাবে কেন? এই যে তুমি আমাকে ইরা না বলে বুড়ি বলো আমার তো রাগ হয় না, rather ভালোই লাগে।

ঠাম্মা - তুমি তো আমার সোনা বুড়ি। তা হ্যাঁ রে বুড়ি, তগো ইস্কুলে তরে কি নামে ডাকে? নাম ধামও কি পাল্টাইয়া দিসে?

নাতনি - তা কেন হবে? ওরা ইরা সেনগুপ্তা বলেই ডাকে।

ঠাম্মা - তাও ভালো তর বাপের মতো সাহেব বানাইয়া দেয় নাই...

নাতনি - তা কেন করবে? Daddy তো ইচ্ছে করেই শ্যামল থেকে নিজের নামটা Samuel করেছে।

ঠাম্মা - তবে যে শুনি অগো দ্যাশে সাহেব না বইন্যা থাকন যায় না?

নাতনি - না গো ঠাম্মা। এরা এদের সংস্কৃতি নিয়ে যেমন গর্ব করে, অন্যের সংস্কৃতিকেও তেমনি মর্যাদা দেয়। আর আমরাই শুধু আমাদের সংস্কৃতি ভুলে এদের মিথ্যে অনুকরণ করি। India is great ঠাম্মা! মেরা ভারত মহান!

ঠাম্মা - ওরে ঠাকুর আমার! আমাগো বুড়ি মা কতো ভারি ভারি কথা শিখসে!

নাতনি - ইয়ার্কি নয় ঠাম্মা ... এই সেদিন Daddy Potter series কিনে এনে আমায় বললো এগুলো এখন In thing পড়ে নিও। আমি তো একটা পড়েই দেখি ওমা, এতো আমাদের ঠাকুমার ঝুলি! শুধু ভাষাটা ইংরেজী। এক্ষেত্রে ওরা আমাদের নকল করেছে।

ঠাম্মা - পটা নতুন বই লিখসে বুঝি? নাকের কামটা ছাইড়্যা দিসে?

নাতনি - ও ঠাম্মা ... তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। ওঠা নাক নয়, NASA। আর ওটা পটার বই নয় Harry Potter -বই ... তাতে রূপকথার গল্প আছে। ইংরেজীতে লেখা।

ঠাম্মা - অ... তাই কও। তা হাঁরে বুড়ি, তগো ইস্কুল কি এই হালের হরিজন ইস্কুলের মতোই বড়ো?

নাতনি - হরিজন না ঠাম্মা, New Horizon School।

ঠাম্মা - ঐ একই হইল। তুই যহন এই ইস্কুলে পড়তি তহন তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া নিয়া আসা ... আমার একটা কাজ ছিল। একটু ঘুরাঘুরি হইত। এর তার লগে দুইটা কথা কওয়া যাইত। আর অহন...

নাতনি - তুমি কিচ্ছু ভেবো না ঠাম্মি। এবার পুজোয় গিয়ে আমি তোমার সাথে থাকবো। তোমার মুখ থেকে চিবোনো পান নিয়ে খাবো, তোমার কাছ থেকে ব্যাঙমা-ব্যাঙমির গল্প শুনবো, তোমায় পটার গল্প শোনাবো আর তোমার মুখে ঘুমপড়ানি গান শুনে তোমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়বো।

ঠাম্মা - ঠাকুর যেন আমায় সেই দিনটার জন্য বাঁচায়ে রাখেন। কিন্তু কোথায় রাখবো তরে মা? তর বাপে তো আমাসে বাড়ি বেইচ্যা আমারে বৃদ্ধাশ্রমে রাইখ্যা গ্যাসে।

নাতনি - কি বলছো ঠাম্মা! আমাদের বৈহাটির পুরনো বাড়িটা Daddy বিক্রি করে দিয়েছে? আর আমি বোকার মতো রোজই ভাবি এবার বাড়ি গিয়ে তোমার সাথে শিউলি ফুল কুড়বো, আমপাছে টুনটুনি পাখিদের আনাগোনা দেখবো, পেয়ারা গাছটায় কাঠবিড়ালিরা ফল খেতে আসবে, গাছে গাছে এই বড়ো বড়ো বাতাবি লেবু ধরেছে ...

ঠাম্মা - নারে বুড়ি। এইসব আর কিসুই নাই। গেলবার বৈশাখ মাসে অহন পটা এসেসে আসছিলো, সেই সময়তেই বাড়ি ঘর বেইচ্যা আমারে এহানে রাইখ্যা গেল। আমার মতো এহানে অনেক বুড়াবুড়ি আসে। আমার পোলা তো বিদেশে থাকে; অনেকের পোলাপান এই শহরে থাইক্যাও মায়-বাপেরে এহানে রাইখ্যা গ্যাসে।

নাতনি - তুমি একদম চিন্তা করো না ঠাম্মা। এই পুজোতেই আমি দেশে গিয়ে তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবো।

ঠাম্মা - আমারে লইয়া যাওনের হইলে তো পটটি লইয়া যইতে পারতো রে বুড়ি। আমাগো সঙ্গে লওয়া যায় না। আমরা হইলাম পথের মতো। আমাগো পায়ে মাড়াইয়া গন্তব্যে যাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে লওয়া যায় না কে বুড়ি। সঙ্গে লওয়া যায় না। (কান্নায় গলা বুজে আসে)

নাতনি - আমি তোমায় নিয়ে আসবো ঠাম্মা। আমি তোমায় আমেরিকায় নিয়ে আসবো। এখানে আমরা একসঙ্গে থাকবো ঠাম্মা। তুমি পথ নও ঠাম্মা, যে যখন পারবে তোমায় মাড়িয়ে চলে যাবে। তুমি শিকড়। তুমিই মূল। You are the root of our existence। আর আমি daddy র মতো rootless হতে চাই না ঠাম্মা।

(নেপথ্যে daddy র গলা ভেসে আসে)

Daddy - Who is my little darling talking to for so long ?

নাতনি - (চোখের জল মুছে) - Dad, your little darling is trying to look for her roots in a big black hole.

"Don't read success stories,
You will get only message.
Read failure stories,
You will get some
ideas to get success..."

- APJ Abdul Kalam Azad

প্রাক্তন

অনুপম ঢালী
প্রথম বর্ষ (ভূগোল অনার্স), রোল - ২৪

অফিসের ম্যানেজারকে আজ না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী করি বলে কি কোন আত্মসম্মান নেই? প্রতিদিন ওই হুমদোমার্কা ম্যানেজার ঘন্টা-দুয়েক বেশি কাজ করিয়ে নেয়, তাই আজ সময় হয়ে যেতেই ম্যানেজারকে বিদায়বার্তা না জানিয়েই বেরিয়েই পড়লাম। বাসস্ট্যান্ডে পাক্কা আধঘন্টা অপেক্ষার পর অবশেষে বাসের নাগাল পেলাম। হুড়মুড়িয়ে আরও পাঁচ জনের মতো বাসে উঠে, জানালার পাশের সিটের সন্ধান করতে লাগলাম। ভাগ্য সহায় থাকায় জানালার পাশের সিটটা লুফে নিতে পারলাম। অফিসের কাজের চাপে শরীরে ক্লান্তির ছায়া নেমে এসেছিল, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একদম হুঁশ ছিল না। ঘুম ভাঙ্গতেই জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বুঝতে পারলাম বাসটা সবে 'বেলেঘাটা' ক্রস করছে। মিনিট খানেক বাদেই এদিক সেদিক চোখ ঘোরাতেই চমকে উঠলাম আমি, আমার দু-একটা সিট সামনেই বছর ষাটেকের এক ভদ্রলোক বসে আছেন, উনি আর কেউ নন, উনি আমার ছোটবেলার প্রিয় শিক্ষক মহাশয় প্রভাস মিত্তির।

"দর্জি পাড়া প্রাইমারি স্কুলের" শিক্ষক ছিলেন উনি। বাংলা বিষয় উনি পড়াতেন, এখনো আমার মনে আছে উনি একদিন আমাকে বলেছিলেন —

- খোকা, পড়াশোনা করে যে কেউ নম্বর পেতে পারে, তবে পড়াশোনার পাশাপাশি আচরণের প্রতি নজর দেওয়া জরুরি।

স্যারের সেই কথা আমি আজও ভুলিনি। তবে উনি সময় মাফিক সব কাজ করতেন, নিজের আত্মসম্মান বোধের ওপর বিশ্বাসী ছিলেন।

অবশেষে নিজের সিটটা ছেড়ে গুটি গুটি পায়ে ওনার পাশের সিটে গিয়ে বসলাম। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম -

- কেমন আছেন স্যার?
- চোখের চশমাটা খুলে একটু ফুঁ দিয়ে তারপর রুমাল দিয়ে মুছে, চশমাটা একটু এঁটে পড়লেন তারপর আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন -
- সৌরভ নাকি?
- হুম, স্যার মনে রেখেছেন দেখছি।
- (হাসতে হাসতে) তুই আমাকে মনে রেখেছিস, তাহলে আমি কিভাবে তোকে ভুলে যাব।
- কেমন আছেন বললেন না তো?
- হ্যাঁ বেশ ভালোই আছি। তুই কেমন আছিস?

- ওই আপনার মতোই আছি। এখন কোথায় থাকেন, গ্রামের বাড়িতে না সোনারপুরের সেই ফ্ল্যাটে?

(একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উনি বললেন -

- বৃদ্ধাশ্রম।
- কথা শুনেই হকচকিয়ে গেলাম। মুখ ফুটে আর কোন কথা বলতে পারলাম না। হাসতে হাসতে প্রভাস বাবু বলতে লাগলেন -
- ছেলে এখন বিদেশে চাকুরী করছে, ওখানেই সংসার পেতেছে।
- আপনার হাত খরচা কি তাহলে ...
- না, আমি একটা পত্রিকা সংস্থাতে লেখালেখি করি, ওতেই কিছু হাত-খরচা মিলে যায়।

জীবনে আর কতদিন বাঁচবো? কাল এসেছিলাম আর আজ চলে যাব।

বুকের ভেতরটা দুমড়ে - মুচড়ে ছারখার হয়ে যেতে লাগল। নিজেক সামলে নিয়ে বললাম -

- স্যার, আপনার ঠিকানাটা যদি লিখে দিতেন, তাহলে আপনার সাথে মাঝে মধ্যে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারতাম।

পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে আমাকে দিলেন। সেখানেই দেখলাম ওনার ঠিকানা লেখা আছে। তবে ওনাকে সাহায্যের জন্য কোন কথা আমি সেদিন বলিনি, জানতাম উনি আমার কোন সাহায্যই গ্রহণ করতেন না, কেননা উনি কখনো নিজেকে অন্যের সাহায্য প্রার্থী হতে চাননি।

মাস খানেক বাদে অবশ্য উনার দেওয়া কার্ডে লেখা ঠিকানা অনুসরণ করে যখন ওনার 'আশ্রয় স্থলে' উপস্থিত হই, তখন ওনাকে আর দেখতে পাইনি।

ওখানকার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, উনি নাকি সপ্তাহ খানেক আগে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে গেছেন। কোথায় গেছেন অনেক সন্ধান করেও আমার প্রিয় শিক্ষককে আর খুঁজে পাইনি। মাঝে মধ্যে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাসের মধ্যে এখানে-ওখানে তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করি সেই বছর ষাটেকের বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রভাস মিত্তিরকে।

"Take risks in your life ...
If you win ; you may lead ...
If you losse ; you may guide ...
- Swami Vivekanand

নারীবাদী সচেতনতা

প্রিয়াঙ্কা নস্কর

প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স), রোল - ৩৫৫

মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ বর্তমান কালেও নারী জাতি বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে। নারীদের সুরক্ষা নিয়ে বর্তমান কালে সংকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যতই বলিনা কেন নারী পুরুষ সমান তবুও নারীদের আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখি। এমন অনেক নারী আছে যারা সারাজীবন পুরুষের খাদ্য হয়ে এসেছে। তা সে কুসংস্কার বশে হোক বা শিক্ষার অভাবেই হোক। অনেকে বলেনে, আজ বর্তমান সময়ে নারীরা অনেকটাই সুরক্ষিত কিন্তু তাই যদি হয় তবে, আজও সংবাদপত্রে নারীদের ধর্ষণ এর খবর থাকে কেন? তাদের নির্যাতনের খবর ছাপা হয় কেন?

উনবিংশ শতাব্দীর নারী বিপ্লবের কথা স্মরণ করলে মনে পড়ে নারীরা তাদের অধিকারের জন্য কিভাবে পুরষ শাষিত সমাজের সঙ্গে লড়াই করে। আর সে লড়াই এক হাত থেকে আর হাতে হতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে যে তার প্রাণদান হয়েছিল - Heloise এর আত্মত্যাগ ও Hypatice র হত্যাতে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলন সাবালক হয়ে ওঠে। Frances Wright এর ডেপুটেশন নিয়ে আমেরিকায় এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ক্রমে Polish Jeuless, Ernestine Rose, Sisters Grimke এবং Quaker দলের ভক্তিমতী Abby Kelly র ন্যায় জগত বিখ্যাত মহিলারা Frances Wright এর সহিত যোগদান করেন। তখন কুসংস্কারপন্ন জিমক্রেট আমেরিকানরা তাদের নানা ভাবে বিদ্রুপ করতে থাকে সেসব নির্যাতনের কাহিনী যদি কোন সহৃদয় মানুষ জানতে চাইলে তাকে Mrs. Cady Stanton's 'History' পড়তে হবে। তবে নারীরা তাদের অধিকারের দাবী পাওয়ার থেকে পিছপা হয়নি। বিশেষ করে বিদেশী মহিলারা এ বিষয়ে এগিয়ে আসেন। তারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে কাজ করতে চায়। ১৮৩২ খ্রীঃ 'Reform Bill'পাশ হয়। নারীরা তাদের নায্য বিষয়ে প্রায় ১৮৫০ খানা পেম্ফলেট ছাপেন। আজ বিলাতের অর্ধেক মেয়েরা পারিবারিক কাজকর্ম ছাড়া বাইরের অনেক কাজ করে যথেষ্ট উপার্জন করেন।

অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীঃ আমেরিকান গর্ভমেন্ট মেয়েদের দাবী মঞ্জুর করেন। আমেরিকার মেয়েদের কৃতকার্য্যতা দেখে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা ও অসীম উৎসাহ ভাবে কাজ করতে এগিয়ে আসে।...

কিন্তু নারীর সামাজিক অবস্থান এর বদল হয়েছে কতটা এই বড় একটা প্রশ্নচিহ্ন আমাদের সামনে দেখা যায়। না হলে আজও কেন পদে পদে ধর্ষণ, হেনস্থা, নারীর সুরক্ষার অভাব একান্তভাবে আজকের দিনে দেখা যায়। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে হলে নারীকে ও সচেষ্ট হতে হবে। নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা, নিজের সুরক্ষার বলয় নারীকে নিজেকেই তৈরী করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে নানা রকম শারীরিক শিক্ষা তাদেরকে গ্রহণ করা উচিত। নারীর সামাজিক অবস্থান আজও অনেকটাই বিপন্ন, এই জন্য সমাজের মনোভাব পরিবর্তন দরকার। আমরা আগের অবস্থান থেকে অনেকটা উন্নত জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। আজ বর্তমান কালে নারীরা রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করতে পারছে। তবে আগামী দিনে নারীকে আরও সচেষ্ট হতে হবে। আরও যত্নবান হতে হবে, নারীর নায্য অধিকার আইন আরও জোরালো করা হবে, যথাযথ মূল্যে নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেন তারা তাদের সঠিক অধিকার পায়। যাতে কোনো নারীরা আর অত্যাচারিত ও শোষিত না হতে পারে, তাদেরকে সম্মান প্রদান করা জরুরি। এখন দেখা যাক এ বিষয়টি কত দূর সফলতা পায়, আগামী দিন নারীর জন্য সুরক্ষা স্বাধীনতা ও মুক্ত আকাশ নিয়ে আসুক এই কামনা।

গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

সৌরভ মন্ডল

প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স), রোল - ৫১৯

এযুগের প্রথম হিউম্যানিষ্ট, বাঙালীর হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত পূণ্যশ্লোক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর অসাধারণ সুললিত ও শব্দ বিন্যাসে, শিল্পের শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত করে আবেগের সঙ্গে পৌরুষ, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম-এর আশ্চর্য মিলন ঘটিয়ে উচ্ছৃঙ্খল বাংলা গদ্যকে যথার্থ - সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ভাষায় পরিণত করেছেন।

কলকাতা ১৮০০ খ্রিঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলা বিভাগের লেখক গোষ্ঠী নবজাত বাংলা গদ্যকে লালন করেছিলেন। আর তাকে শৈশব থেকে কৈশোরে উন্নীত করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আর তাকে যৌবনের গৃহাশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে বিচিত্র প্রাণের স্পর্শে উজ্জ্বল ও শিল্পময় করে তুলেছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের বাংলা গ্রন্থ গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, -

ক) অনুবাদ মূলক রচনা ঃ অনুবাদ মূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য - ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত বাসুদেব চরিত (১৮৪৭), ভবভূতির উত্তরামচরিত এবং বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকান্ডের অনুবাদ সীতার বনবাস (১৮৬০), মার্শম্যানের History of Bengal এর কয়েক অধ্যায়ের অবলম্বনে রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), চেম্বারস Biographies এর Rudiments of Knowledge এবং অবলম্বনে রচিত জীবনচরিত (১৮৪৯) ও বোধোদয় (১৮৫১), ইশপের ফেবেলস অবলম্বনে রচনা করেন কথামালা (১৮৫৬)। এছাড়া হিন্দি বৈতাল পচ্চীসীর অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', রাজা বিক্রমাদিত্য ও বেতালের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর পর্বের দ্বারাই গ্রন্থটির আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম এর অনুবাদ শকুন্তলা' শেক্সপিয়ারের 'Comedy of Errors' এর ভ্রান্তিবিলাস। এই বই সম্পর্কে বিহারীলাল চক্রবর্তী বলেছেন -

"ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙালি উপন্যাস হইয়াছে।"

খ) মৌলিক রচনা ঃ বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থগুলি হল, - 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম খন্ড - ১৮৫৫) (২য় খন্ড -১৮৫৫), 'বহু বিবাহ রচিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১ম খন্ড - ১৮৭১), ২য় খন্ড - ১৮৭৩), 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১), 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩)।

গ) ব্যঙ্গ রচনা : রঙ্গব্যঙ্গের তির্যকতায়, আঘাতের তীব্রতায় প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলার সামর্থ্যে এই গ্রন্থগুলির ভাষারীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লেখেন 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪), এবং 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' ছদ্মনামে লেখে 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন -

"এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা
বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আছে"।

ঘ) পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির রচনা : বিদ্যাসাগর কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য রচনা করেছিলেন যেমন, - বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), ব্যাকরণ কৌমুদী, শব্দ মঞ্জরী।

গদ্যশৈলী : বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার সুনিপুন প্রয়োগ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে
সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া
তাহাকে সহজ গতি দান করিয়াছেন এখন তাহার দ্বারা
অনেক সেনাপতি ভাব প্রকাশের কঠিন বাঁধা সকল পরাহত
করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া
লইতে পারেন - কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধ
জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"

বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য ভাষাকে শিল্প সুষমা মন্ডিত করেছেন। গদ্যের ভিতরের সৌন্দর্য ও ছন্দটিকে আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের। বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের বহু প্রসারী অবদানের কথা স্মরণ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন -

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার
প্রথম যথার্থ শিল্পী।"

তাঁর ব্যবহৃত গদ্যভাষা সম্পর্কে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন -

"বাংলা গদ্যের কায়া নির্মাণে যাঁরা দায়ী
থাকুক না কেন, এর শ্রী ও হ্রী বিদ্যাসাগরের দান।"

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা গদ্যে যে একটা প্রবাহমান স্রোত ও ধ্বনিতরঙ্গের বিস্তার আছে তা সবই ফুটে উঠেছে বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিরাম চিহ্নের দ্বারা তিনি ভাবকে শুধু পর্বে বিভক্ত করেননি, তাঁর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আর সেই তরঙ্গের বাঁধ দিয়েই আধুনিক বাংলা গদ্যের কায়া ও কান্তি নির্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রাণধান যোগ্য, -

"যে শিশুটা (বাংলাগদ্য) অবহেলায় লালিত
হচ্ছিল, অনাদারের জন্য যার না ছিল স্বাস্থ্য,
না ছিল শ্রী ছাঁদ তাকেই স্নেহে লালন করে
লাবন্য ও শক্তির অধিকারী করেছিলেন
বিদ্যাসাগর।"

রতনের গল্প

সেলিমা খাতুন
প্রথম বর্ষ (ইংরেজি অনার্স), রোল - ১০৭

সময়টা গ্রীষ্মকাল। প্রচন্ড গরমে প্রকৃতি যেন বিষিয়ে উঠেছে। সূর্য দেবতার তীক্ষ্ম কিরণে নদী নালা নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলেছে, কোথাও - এক ফোঁটা জল নেই। সামনের দিগন্ত জোড়া মাঠে কোথাও ফসলের ছিটে ফোটা নেই, যেন দোর্দন্ড প্রতাপ সূর্যরশ্মি তাদের সবুজ রূপকে কেড়ে নিয়ে সর্বাঙ্গকে ফেটে চৌচির করে দিয়েছে। সূর্যের এমন তেজে নাজেহাল মানুষ প্রচন্ড দাবদাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরোতে চায় না, কিন্তু এই সময় প্রচন্ড তাপ সহ্যকারী চম্পা ফুলের মত এক বালক তার রিকশায় যাত্রী নিয়ে চলেছে গ্রীষ্মের পথে।

বালকটির নাম রতন। বয়স মোটে পনেরো। সে থাকে কদমপুর গ্রামে। রতনের বয়স যখন সাত বছর, তখন তার বাবা মারা যাওয়ায় মা-ই ছিল তার সহায়। কিন্তু গত দুবছর হল তিনি এক কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। তাই সংসারের হাল ধরতে হয় রতনকে। প্রথমে সে একটা চায়ের দোকানে কাজ নিলেও তাতে সংসার চলত না, মায়ের সঞ্চিত কিছু টাকা দিয়ে সে একটা রিকশা কেনে। তখন থেকেই কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, কী শীত - রতন তার রিকশা নিয়ে ঠিক চলে যায় বাজারের রিকশা স্ট্যান্ডে। প্রকৃতির কোনো রূদ্র রূপ-ই তাকে দমাতে পারে না। স্ট্যান্ডে সে যাত্রীর আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে দু-চোখে মাকে সুস্থ করে তোলার অসীম স্বপ্ন নিয়ে।

সকালে রতন ঘুম থেকে উঠে রান্না করে মাকে খাইয়ে রিকশা নিয়ে চলে যায় বাজারে। তারপর সন্ধ্যায় ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাকে সে কোনোরকমে বাড়ির দিকে নিয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে মাকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে মায়ের কাছে আরব্য রজনীর গল্প শুনতে শুনতে সে চলে যায় কল্পনার জগতে ; আর ভাবে কোনো এক দৈবিক শক্তি এসে যদি তাদের দুঃখ মোচন করতে পারত, সুস্থ করে দিতে পারত তার মাকে - এই সব ভাবতে ভাবতেই সে মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন সে স্ট্যান্ডে বসে থাকে যাত্রীর অপেক্ষায়, চোখে মুখে উদ্‌বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট - সে ভাবে আজ যে ভাবেই হোক ওষুধ কিনতেই হবে, এসব সে যখন ভাবতে থাকে, পেছন থেকে কে একজন ডাক দেন - "কিরে রতন! ভাড়া যাবি নাকি?" রতন চমকে পেছন ফিরে দেখে গ্রাম প্রধান সতীশচন্দ্র রায়। হাতে তরকারী ভর্তি থলি নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ি যাওয়ার জন্য। রতন নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রিকশা নিয়ে চলে যাত্রীকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। কিন্তু রিকশা থেকে নামার পর রতন ভাড়া চাইলে তিনি প্রচন্ড রেগে গিয়ে বলেন - "কী? তোর এত বড় সাহস! আমার কাছে ভাড়া চাস? আমি যে তোর রিকশাতে উঠেছি এটা তোর সৌভাগ্য।" কিন্তু রতনের তখন খুব টাকার দরকার, তাকে যে আজ মায়ের জন্য ওষুধ কিনতেই হবে। প্রচন্ড বচসা শুরু হয় দুজনের মধ্যে। রাস্তায় চলমান লোকগুলোও

দাঁড়িয়ে পরে এই দৃশ্য দেখে। তারা সবাই রতনকে বকাবকি করতে থাকে প্রধান সাহেবের কাছ থেকে ভাড়া চাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো জন্য। সবাই চলে যাওয়ার পর রতনের চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায়। সে আজও হয়ত মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে পারবে না। দেখতে দেখতে গ্রামে ভোটের সময় এগিয়ে আসে, রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেন, চলে প্রতিশ্রুতির বহর। এসববের মাঝে একদিন ভোট শেষ হয়ে ভোট গণনায় দিন চলে আসে। গ্রামের মাথা থেকে সাধারণ মানুষ - সবার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা। এসবের মাঝে নেই কেবল রতন। সে এসব রাজনৈতিক কিছুই বোঝে না। তার ভাবনার জগতে শুধু তার মা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয় প্রকটিত হয় না। যাই হোক, ভোট গণনার পর বিজয়ী পার্টি উল্লাসে ফেটে পড়ে, পাড়ায় পাড়ায় চলে বিজয় মিছিল, আর সেই সঙ্গে চলে বিরোধী দলের লোকেদের উপর অত্যাচার। বিজিত পার্টির সদস্যরা বাজারে লুটপাট করে, ভাঙচুর চালায়। তারা রতনের একমাত্র রোজগারের হাতিয়ার তার রিকশটাকেও ছেড়ে দেয়নি, প্রধান সাহেবের সঙ্গে বচসার অপরাধের শাস্তি পায় তার রিকশা। ভাঙচুরকারী দল তার রিকশাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। রতন শত চেষ্টা করেও সেটাকে অক্ষত রাখতে পারেনি। তারপর সে রিকশার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অংশগুলোর পাশে বসে বাক্যহারা হয়ে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে দূরে চলে যাওয়া দলের দিকে, যারা তার রিকশার সলিল সমাধি ঘটিয়ে লুন্টন করে নিয়ে গেছে তার সমস্ত স্বপ্নকে।

Life is Beautiful
"One day, one hour and one minute,
will not come again in your entire life. Avoid fights, angriness
and speak lonely to every person"
- APJ Abdul Kalam Azad

সাগরের ঢেউয়ে ভেসে রইল মানবকিতা

জাহিরুল ইসলাম
প্রথম বর্ষ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স), রোল - ৩৬৪

'বড় ভাই, আর বাঁচলাম না, ডুবে মরলাম, হে ভগবান' বাঁচাও। জিসান, হারুনের বাহু ধরে কেঁদে ফেললো।

'ঘাবড়াস না, ভগবান মালিক, তৈরি থাক, সাগরে লাফ দিতে হবে। সাঁতরাতে পারিব তো? হারুন সান্তনা দিল জিসান কে। তারও মন ভিতর থে দুর-দুর করছে। লঞ্চের ডেকের কয়েকশ মুসাফিরের মধ্যে এরা দু-জন। সবার অবস্থা এাহি এাহি।

বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ঢেউ ও ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাত্রীবাহি লঞ্চ হাবুডুবু খাচ্ছে। ঘন্টা খানেক আগে লঞ্চ যখন নামখানা ছেড়ে আসে তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিছুক্ষণ পরেই সারা আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। লঞ্চ মৌসুমী দ্বীপে যাচ্ছিল। কয়েকশ মুসাফির নিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় পৌছালে ভীষণ ঝড় উঠল। চারিদিকে বড়ো বড়ো ঢেউ লঞ্চের উপর আছড়ে পড়ছে। লঞ্চ একবার ডানে, একবার বামে কাৎ হয়ে যাচ্ছে।

সারেং লঞ্চের ইঞ্জিন চালু রেখেছে এবং মৌসুমির দিকে মুখ রেখে লঞ্চকে চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় ইঞ্জিন থামলেই বিপদ, কাৎ হয়ে ডুবে যাবে।

মুসাফিরদের অবস্থা খারাপ। সবাই দৌড় দৌড়ি করছে। সবারই চেহারা মৃত্যুর ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সবার মুখে ভগবানের নাম। একজন আজান দিতে শুরু করল। আরেকজন ভগবানের নামে যব করতে লাগল। 'ভগবান ভগবান' বলরে সবাই - একজন বলে উঠল। ঝড় থামছে না। আরও বেগবান হচ্ছে। হঠাৎ একটু পূর্ব দিকে ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণা বাতাসের এক ধাক্কায় লঞ্চ কাৎ হয়ে গেল। অনেক লোক ছিটকে মোহনায় পড়ে গেল। দক্ষিণ দিক দিয়ে লঞ্চে পানি ঢুকে গেল। লঞ্চ আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করল।

'লঞ্চ ডুবছে ; লঞ্চ ডুবছে।' লঞ্চের একজন খালাসি চিৎকার করে বলল ছোটো নৌকা নামাও, লাইফবোট নামাও। খালাসি দৌড়ে সারেং-এর কেবিনের দিকে চলে গেল। ঝড়ের আওয়াজ, সাগরের গর্জন, মানুষের আহাজারি - সব মিলেমিশে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারোরই মালপত্রের মায়া এখন আর নেই। শুধু জীবন বাঁচানোর চেষ্টা। ভগবানে নামে ধ্বনি।

হারুন ও জিসান ডুবন্ত লঞ্চ থেকে সাগরে লাফ দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তারা কোনও ছোটো নৌকা পায়নি। হারুন দেখল পাশের একটা আট-দশ ফুট লম্বা কাঠের তক্তা পড়ে আছে। জিসান ধরল তক্তা, এটা নিয়ে লাফ দিতে হবে। হারুন বলল।

দুজন তক্তার দুই ধারে ধরে লঞ্চের কিনারায় এসে পড়ল। ইতিমধ্যে অনেক লোক ছিটকে অথবা ঝাঁপ দিয়ে সাগরে পড়ে সাঁতরাচ্ছে।

হারুন বলল, লঞ্চ ডোবার আগেই এখান থেকে দূরে সরে পড়তে হবে। না হলে লঞ্চের সঙ্গে পানির টানে আমাদের ও তলিয়ে যেতে হবে। ভগবানের নাম নিয়ে দু-জন একসঙ্গে লাফ দিল। সাগরের পানিতে পড়ল এক হাতে তক্তা ধরে, আরেক হাত দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাড়াতাড়ি সাঁতরিয়ে লঞ্চ থেকে দূরে সরে গেল।

হারুন ও জিসানের বাড়ি মৌসুমি দ্বীপে। সাগরে সাঁতারের অভ্যাস আছে। তারা জানপ্রাণ দিয়ে সাঁতরিয়ে চলেছে। ঝড়ের বেগ ও সাগরের ঢেউ তখনও কমেনি। লঞ্চ ডুবে গেছে। লোকেরা বিভিন্ন ভাবে সাগরে সাঁতরাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় মাঝে মাঝে মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। মৌসুমি দ্বীপ এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। হারুন ও জিসান তক্তা ধরে ভাসছে। ঢেউয়ের একবার ডুবে যাচ্ছে, আরেকবার ভেসে উঠছে। হারুন বুঝতে পেরেছে একটা তক্তা দু-জনকে সামলাতে পারবে না।

হারুন ছোটোবেলা থেকে সরকারি অফিসের একজন অফিসারের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। চেহারায় ফরসা রং স্বাস্থ্য ভালো। মধ্যম উচ্চতা। সব সময় হাসি খুশি চেহারা। ব্যবহারও ভালো। মানুষের সেবা করতে তার ভালো লাগে। বড় হয়ে অফিসের পিয়নের চাকরি নেয়। বছরে দু'একবার বাড়িতে যায়। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ট্রেনে নামখানা, তারপর লঞ্চে চেপে মৌসুমি দ্বীপ।

এবারে একটা পারিবারিক প্রয়োজনে তার ছোটো বোনের স্বামী জিসানকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। জিসান কলকাতার চাঁদনী মার্কেটে পান বিক্রি করে। ধর্মতলা স্ট্রিটে তার একটা ছোটো পানের দোকান আছে। পরের দিন সকাল। মৌসুমি উপকূলে লোকের ভিড়। লঞ্চ ডুবে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা মৌসুমি দ্বীপে। উপকূলে জেলেদের নৌকা কিছু কিছু লোককে সাগরে ভাসমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করে কূলে নিয়ে এসেছে। লোকেরা তাদের কাছ থেকে আত্মীয়-পরিজনের খোঁজ নিচ্ছে।

জিসান খালি গায়ে শুধু লুঙ্গি পর অবস্থায় মাথায় দু-হাত দিয়ে বসে কাঁদছে। হারুন ভাই, হারুন ভাই বলে বিলাপ করছে। তারপর চারপাশে লোক ঘিরে আছে। বৃদ্ধ লোকটা জিসানের গ্রামের লোক। এই এলাকায় কোনও একটা কাজে এসেছিল। লঞ্চ ডুবে যাওয়ার খবর শুনে সেও খবর নিতে এসেছে। জিসানকে দেখে চিনতে পারল। কাছে এসে জিসানকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। জিসান বাবা, ভগবান তোমাকে বাঁচালেন, জিনিসপত্র গিয়েছে যাক, আবার হয়ে যাবে, দুঃখ করো না।

জিসান হাউ-হাউ করে কেঁদে বলল, চাচা হারুন ভাইকে তো আর পাবো না। সে আমাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ দিল।

হারুন কে? কি ঘটনা বলো? বৃদ্ধা বলল। জিসান বলল, হারুন আমার স্ত্রীর বড়ো ভাই। আমি ও হারুন একটা তক্তা নিয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়েছিলাম প্রাণ বাঁচানোর জন্য। পরে দেখলাম একটা তক্তায় আমরা দু-জন ভাসতে পারব না। দু-জনের বোঝা একটা ছোট তক্তা বহন করতে পারছে না। বার বার ডুবে যাচ্ছে। তখন হারুন ভাই আমার জন্য তক্তা ছেড়ে দিলেন। আমার কিছু বলার আগেই তিনি তক্তা ছেড়ে খালি হাতে সাঁতরাতে লাগলেন। মুহূর্তে সাগরের ঢেউ তাকে অনেক দূরে চলে গেল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলাম না। দক্ষিণ দিকে সাগরের অথৈ পানিতে তলিয়ে গেলেন। বলতে বলতে জিসান হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

হারুন ভাই আমার জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন। আমি তার শোধ দিতে পারব না।

চারপাশের লোকগুলো দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে জিসানের কথা শুনছে...।

এক বিংশ শতাব্দীর ভারত

রাহুল সরদার
প্রথম বর্ষ (এডুকেশান অনার্স), রোল - ১৯৫

স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা কি স্বাধীন হতে পেরেছে, আমরা কি পেরেছি হিংসা, জাতিভেদ, নিজ স্বার্থসিদ্ধি, ব্যক্তি বৈষম্য, অহংবোধ, ধর্মভেদ, রাজনৈতিক বিভেদ প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে? যতদিন না আমরা আমাদের সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন এই বিভেদ গুলি সমাজে থেকেই যাবে। আর তার জন্য সমাজের অবনতি ঘটবে। ভারতবর্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ, আর এখানকার আইন নাকি সকলের জন্য সমান, কিন্তু বর্তমানে ভারতের মানুষ কি গণতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে? গণতন্ত্র আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আর আইন কানুনের কথা তো প্রায় সবাই জানে, ভারতীয় সংবিধান নাকি বিশ্বের সবথেকে বড়ো সংবিধান, কিন্তু এই সংবিধান মেনে কটা কাজই বা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে নির্দোষ সে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলের অন্ধকারে জীবন কাটায়, আর যে প্রকৃত দোষী সে সারাদেশ দাপিয়ে বেড়ায়। প্রশাসনিক বিভাগে যারা কাজ করছে বর্তমানে তাদের দ্বারাই মানুষ শোষিত হচ্ছে। কিন্তু কেন আজও আমরা শোষিত হব?

বর্তমানে খবরের কাগজ খুললেই প্রতিদিনই দেখা যাবে ধর্ষণের চিত্র। কিন্তু কেন? একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কি এই ধরনের ঘটনা আশা করা যায়, সমাজে আজও কেন নারীরা লাঞ্ছিত? রাজনৈতিক বা ধর্মীয়, স্বার্থসিদ্ধি বা লোভ প্রভৃতি তুচ্ছাতি তুচ্ছ কারণে বিরোধ বাধলেই 'খুন', 'বোমাবাজি', 'রক্তপাত', 'প্রাণনাশ'। সত্যিই ভাবতে লজ্জা। মানুষের নৈতিকতা বলে কি কিছুই নেই আজ। কোনো দিন কেউই কারো প্রাণদান করতে পারে না, তাই যে 'খুন' করছে তারও কোনো অধিকার নেই কারো প্রাণনাশ করার। আচ্ছা আমরা কি ভেবে দেখেছি যে মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছিল, সেই মেয়েটি কি সঠিক বিচার পায়? পেলেও কত দিন পর? ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা এতটাই ধীরে চলে যে, 'টু-জি নেট স্পীড' বললেও বোধ হয় ভুল হবে। যদি বা দীর্ঘদিন পর একটি মামলার নিষ্পত্তি হয় তাহলেও সেই দোষী ব্যক্তির শাস্তি খুব একটা বেশি হয় না। আর অনেক সময় তো সেই মেয়েটি লজ্জার কারণে সমস্ত ঘটনা চেপে যায়, বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। সারা দেশে আজ ঘটে যাওয়া এত অন্যায়ের জন্য দায়ী আমরাই। আমাদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতাই আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। যদিও প্রতিবাদ হয় তাহলেও সেটা অল্প সংখ্যক মানুষের প্রচেষ্টা। আসলে আমাদের মধ্যে নেই কোনো ঐক্য, নেই কোনো একতাবোধ, যার দ্বারা আমরা প্রত্যেকটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হব। এই জন্যই কি ভারতের বীর-সন্তানেরা সেদিন নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে দেশকে পরাধীনতার অন্ধকার থেকে স্বাধীনতার নবদিগন্তে পৌঁছে দিয়েছিল। আর আমরা কিনা, তাদের সেই স্বাধীনতার ফসলকে ভোগ করছি, আবার নষ্টও করছি। কোথায় গেল আমাদের মূল্যবোধ, জাতীয়তাবোধ।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই আজ ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ, নিজ স্বার্থসিদ্ধি, হিংসা, অন্যায়, আইনভঙ্গ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কারণ বর্তমান শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ও ডিগ্রি অর্জন করে যে ভাবে হোক জীবিকা নির্বাহ করা। স্বাধীনতার পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির যে জন্য ১৯৪৮ সালে রাধাকৃষ্ণান কমিশন, ১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশন, ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮ সাল ও ১৯৮৬ সাল) গঠিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কিত সুপারিশে নৈতিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, উন্নত চরিত্র গঠন, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা প্রভৃতি বিকাশের কথা বললেও আজও তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অতীতে ১৭৫৭ খ্রিঃ যে ভাবে মীরজাফর সিংহাসনের লোভে রবার্টক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে সিরাজ উদ দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তার ফলে পরবর্তী একশো নব্বই বছরের জন্য ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রে শুধু মীরজাফর বা তার ছেলে মিরণই নয় সঙ্গে ভারত তথা বাংলারই কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, ইয়ার-লতিফ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখরা যুক্ত ছিলেন। এবং তাদের পতনও খুব শীঘ্রই ঘটেছিল। তাই বর্তমানে আমরা যদি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অতীতের মতো সেই একই ভুল করি তাহলে ভারতের মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, বিঘ্নিত হবে শান্তি শৃঙ্খলা।

আচ্ছা আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে আমরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছি, আর কেনোই বা এই পৃথিবী থেকে চলে যাবো? জন্ম-মৃত্যুর ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রন থাকে না। আমরা খুব সীমিত সময় এই পৃথিবীতে থাকতে পারি। তাই আমরা যদি আমাদের এই সীমিত জীবন কালে ভালো কোনো কাজ না করতে পারি, মানুষের জন্য ভাবতে না পারি, তাহলে আমাদের এই বসুন্ধরা মাঝে আসা সার্থক হবে না। বিবেকানন্দ এমন একটা ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, "যেখানে থাকবে না কোনো উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ, থাকবে না কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ।" আমরা ভারতবাসী প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভ্রাতৃতুল্য, পিতৃতুল্য, আর নারীরা মাতৃতুল্য ও ভগ্নিতুল্য। তাই বিবেকানন্দ ও ভারতের বীর বিপ্লবীদের স্বপ্ন যদি সার্থক করতে হয় তাহলে -"রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাঁর সংকীর্ণ ব্যক্তি চেতনা ও মনোভাবকে অতিক্রম করে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।" আমরা একই রক্তে-মাংসে গড়া, একই মায়ের সন্তান, তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে - ধর্মীয় ভেদাভেদ, রাজনৈতিক ভেদাভেদ, হিংসা, অহংকার। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ প্রভৃতি। এগুলো যদি আমরা ভুলে যেতে পারি তাহলেই ভারত তথা বিশ্বের যে কোনো দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে ও উন্নতি হবে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গল হবে তখনই, যখন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে জেগে উঠবে এবং তাদের প্রকৃত মূল্যবোধের জাগরণ ঘটবে।

সবার আড়ালে মা

মুনমুন রায়
প্রথম বর্ষ (সংস্কৃত অনার্স), রোল - ৪৪৮

মা শব্দটি এমন একটি শব্দ যে শব্দ উচ্চারণ করলে এক অদ্ভুত মায়া স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা মনের কোণে উঁকি দেয়। মা আমাদের জন্মদাত্রী। তিনি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেন আমাদের। শত সহস্র কষ্ট যন্ত্রনা সহ্য করে পৃথিবীর আলো দেখান। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ সৌন্দর্য অনুভব করান। মা হলেন মমতাময়ী। তাঁর ঋণ কোনোদিনও শোধ করা যায় না। শুধু এই সময় নয় পুরাকালেও মাতৃ বন্দনার কথা উল্লেখ আছে। মায়ের একটি মাত্র বাক্যে অর্জুন নিজ পত্নী দ্রৌপদাকে তার ভাইয়েদের মধ্যে ভাগ করে নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। শুধু মহাভারতে নয় আরও অন্যান্য গ্রন্থে আমরা মাতৃ বন্দনার উল্লেখ পাই। আমরা আজও মাকে ভালোবাসি, স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি তাই তো প্রতি বছর খুব ধুমধাম করে মাতৃশক্তির আরাধনা হয় সারা পৃথিবী জুড়ে। তাইতো আজও মে মাসের ১০ তারিখ পালন করা হয় মাতৃ দিবস। মায়ের সাথে অন্য কোনো কিছুর তুলনা হয় না। তাইতো জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি সরীয়সী।

মা শব্দের মধ্যে যেমন আছে মায়া, মমতা, স্নেহ ঠিক তেমনই আছে কষ্ট, আর বুকফাটা কান্না। যে কান্না চোখের জল হয় নয় মুখের হাসি হয়ে প্রকাশ পায় সব দোষ ঢাকা দেওয়া আঁচল হয়ে আমাদের মাথার ওপর থাকে। সবার চোখের জল মোছার জন্য মা আছে কিন্তু মায়ের চোখের জল মোছার জন্য কি কেউ আছে। আচ্ছা? আমরা কি কখনো মাকে বালি - মা তোমার কী দরকার? মা তোমার কি চাই? মা তোমার শরীর ভালো আছে? কেউ জিজ্ঞাসা করি না। মাছের বড়ো মাথাটা যখন মা আমাদের পাতে দেন তখন আমরা কেউ ভুলেও বলি না মা আজ এটা তুমি খাও। বলি কি? কিন্তু পান থেকে যদি চুন খসেছে তাহলে আমরা মায়ের উপর চিৎকার করি রাগ করি কষ্ট দিই মাকে। আর সবার আড়ালে মা চোখের জল ফেলেন। তবুও তিনি হাসি মুখে বলেন - বলো তোমার কী হয়েছে? মায়ের মমতা এমন এক অফুরন্ত সীমাহীন ভান্ডার যে ভান্ডারের ধন কোনো দিনও শেষ হবে না। মায়ের কাছে আমরা কত ভাবে কত দিক দিয়ে ঋণী। মা সবকিছুর উর্দ্ধে। সবকিছুর শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি সন্তানের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা তিনি জন্মের সঙ্গে আমাদের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান উপহার দিয়েছেন যার নাম - 'মা'। বট বৃক্ষের ন্যায় মা আমাদের সবসময় শীতল ছায়ায় আবৃত করে রাখে। মা সবাই হয় না। মা হওয়ার অধিকার ভগবান সবাইকে দেন না। মা হওয়ার যোগ্যতা সবার থাকে না। ভগবান তাকেই বেশি কষ্ট দেন যার কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে। তাই তিন মা তাকেই করেন যার মায়ের কষ্ট, যন্ত্রনা হাসি মুখে সহ্য করার ক্ষমতা থাকে। পৃথিবীর সব মায়ের এই রকম দশভূজা, মমতাময়ী, স্নেহময়ী। সব মায়েদের এবং আমার মমতাময়ী মায়ের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সবশেষে একটা কথাই বলব -

অভিযোগ নেই কিছুই মাগো
অল্প কটা দিন
পরের জন্মে শুধবো মাগো
না হয় তোমার ঋণ।

আত্মহত্যার পিপাসা

সুমন পাল
দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা অনার্স)

কমলের চিঠিটা পেয়েই আমি ইতস্তত হয়ে সেখানে যাবার উপক্রম করতেই রঞ্জনের সাথে দেখা।

আমি অখিলেশ, কমল, রঞ্জন এরা সবাই আমাদের কলেজের বন্ধু। ওরা আমাকে অখিল বলেই ডাকত। কমল একটি মেয়ের খোঁজে পাঠানপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করে এবং মেয়েটি নাকি আত্মহত্যা করেছে তার যাওয়ার পূর্বেই। তাই আজ চিঠি ...

"অখিলেশ, আমাকে নিয়ে যা ভাই, আমি রীতিমতো মুমূর্ষ হয়ে পড়েছি, আমি আসার পূর্বেই নাকি মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, তুই কিছু একটা ব্যবস্থা কর" আমি চিঠির ব্যাপারে রঞ্জনকে বলতেই সে নড়ে বসে -

আমি যাবো না! আমি প্রথমে বলেছিলাম যে, কমলের ওখানে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। তুই গেলে যা, আমি যাব না।

রঞ্জনের কথাতে প্রথমে অনুতপ্ত বোধ করলেও, আমি রওনা দিই।

আমার কমলের কাছে পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। কমল দরজা খুলতেই আমার শরীরে যেন শিহরণ খেলে যায়। একটা বাঘ যেন এক-মাস না খেয়ে আছে, লিকলিকে চেহারা, চোখ দুটো ঢুকে গেছে, কেশগুলি যেন প্রায় ওঠবার উপক্রম করছে।

আমি বললাম, কমল কেমন আছিস?

আর বলিস না, ভাই !

আচ্ছা বাবা তুই কেন এমন হয়ে গেছিস, এবং কিসের জন্য তোর আজ এই অবস্থা, না বললে আমি বুঝবো কিভাবে বল?

কমল রীতি মতো একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে এবং বলতে শুরু করে ...

সেদিন বর্ষার রাত, আমি সবে ঘরে এসে উঠেছি।

বাড়িতে কেউ আছেন?

হ্যাঁ বাবু !

শুনেছি নাকি এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়।

তো আমি কিছুদিন থাকবো এখানে।

হ্যাঁ বাবু ! জরুর আইয়ে।

সামনে যেতেই দেখলাম লোকটি বেশ বয়স্ক। সে আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে খাবারটা টেবিলে রেখে চলে যায় নিজের ঘরে।

আমার আবার একটু রেডিও শোনার অভ্যাস ছিল। রেডিওটা চালিয়ে খেতে লাগলাম।

রাতের খাওয়া শেষ হতেই মনে পড়ে গেল সেই মেয়েটির কথা! যার জন্য আমার এখানে আসা। আমি ছুটে চলে গেলাম চৌকিদারের ঘরে।

চৌকিদার ও চৌকিদার ...

অনেক ডাকার পর - হ্যাঁ বাবু !

আমি আর কুণ্ঠাবোধ করলাম না, বলেই ফেললাম। এখানে শতরূপা বলে কেউ থাকে?

আমি নাম বলতেই চৌকিদার এমনভাবে হতভম্ব হয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হয় মেয়েটির কোনো বিপদ হয়েছে হঠাৎ কেঁদে ওঠে এবং বলতে শুরু করে ...

মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে বাবু ! ঐ মোহিনীর জলে ডুব দিয়েছে। তুমি ফিরি যাও বাবু, তুমি ফিরি যাও।

বলতে বলতে সে ঘরে দরজা লাগিয়ে দেয় এবং আমি আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার যেন ঘুমই আসছে না। শুধু যেন বারে বারে মনে হচ্ছে সেই শতরূপা নামধারি মেয়েটির কথা। আমি তো তাকে কোনোদিন দেখিনি। তাহলে কেন তার জন্য আমার হৃদয় বেদনা, আমি কি তাহলে ক্রমশ তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছি?

স্মরণ করতে করতে যে আমি কখন নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিলাম জানি না। আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার কারণ খুঁজতেই বুঝলাম বাইরে প্রবল ঝড় বইছে এবং ঘরের জানালা দম্‌কা বাতাসে খুলে গেল। তখনই অমার ঘুম ভেঙে যায়।

হঠাৎ দেখি আমার ঘরের দরজা খোলা এবং মনে হল আমার ঘরে কেউ এসেছিল। আমি উঠলাম আস্তে আস্তে চললাম বাইরের দিকে মনে হল আমার সামনের ওই আম্রকানন দিয়ে হেঁটে চলেছে এক যুবতী সেই মোহিনীর তীরে। আমার সারা শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। আমি রীতিমতো ভীত হয়ে ভাবতে লাগলাম একি সেই শতরূপা !

না না এসব আমি কি ভাবছি। যুবতীটি কে নিশ্চিত হতে এগিয়ে চললাম সেই পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম কে যেন সেই জলে ঝাঁপ দিল, আমার সারা শরীর যেন কেঁপে ওঠে এবং কে যেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার কাছে যাওয়ার।

সেদিন রাতে আমার ঘুম হলো না। পরের দিন সকাল বেলাতে ঘুমোলাম এবং ঘুম ভাঙলো ঠিক দুপুরের দিকে। দুপুরে খাওয়ার পর স্মৃতিচারণ করতে করতে শুধুই মনে হচ্ছে শতরূপা কি আমাকে আত্মহত্যার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আসলে সেই যুবতী-ই কী শতরূপা?

ঘটনাক্রমে আবার সেই রাত, আবার সেই মোহিনীর পাড়ে যাওয়া, তার আত্মহত্যা যেন আমার প্রবল তৃষ্ণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি রজনীতে যেন আমি ছুটে যাই সেই আত্মহত্যার সন্ধানে কিন্তু তা আর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। সে যেন এক অনন্ত পিপাসা।

এইভাবে এক মাস কেটে যায়। আমি কেবল মূর্ছিত হয়ে পড়েছি। আমার চলার শক্তি খর্ব হয়েছে। তাঁর আত্মহত্যা যেন আমাকে কেবল দগ্ধ করেছে। আমার শরীর যেন আত্মহত্যার স্বাদ পেতে চাইছে। তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাময়

কমল কথাগুলি বলতে বলতে ভেঙে পড়ে। আমি বললাম চল, তোকে আর এক দন্ড এখানে থাকতে হবে না। কাল সকালে দশটার ট্রেনে বেরিয়ে যাব।

সেদিন রাতে কমল আর কিছু বলল না। সকাল বেলাতে চা খেয়ে আমরা রওনা দিলাম সেই স্টেশনের দিকে এবং সেই আম্রকানন মোহিনীর তীর পেরিয়ে স্টেশন। আমি কমলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে যেন উদাসীন। তার মনে যেন এখনো সেই আত্মহত্যার তৃষ্ণায় বাধিত। হঠাৎ কমল সেই মোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে শতরূপা ! আমি বিস্মিত হয়ে ...

কি হয়েছে কমল, শরীর খারাপ লাগছে?

একটু গুভরে না, না , কিছু হয়নি চল।

আবার চলতে লাগলাম। অবশেষে ট্রেনে চেড়ে বসলাম। ট্রেন চলতে লাগল।

Talk to yourself at least once in a Day. Otherwise you may miss a meeting with an EXCELLENT person in this world.
- Swami Vivekananda

ভ্রমণে অদ্ভুত ভূত

আবুল ফারাক মোল্যা
প্রথম বর্ষ (ভূগোল অনার্স) রোল- ১২

জ্যৈষ্ঠ মাসের ভ্যাবসা গরমের জন্য স্কুল যেতে তেমন ভালো লাগে না। মা-বাবা যাতে না বকাবকি করে সেই জন্যই যাওয়া। স্কুলের টিফিন টাইমে আমি, একরামুল, জাকির, ইয়ানুর বসে বসে টিফিন খেতে খেতে আলোচনা করছিলাম গরমের ছুটি কবে দেবে! আর ছুটি দিলেই সবাই ঘুরতে যাব। এসব নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। টিফিন শেষ হওয়ার পর সুজাউদ্দিন স্যার ক্লাস নিতে আসল তার পিছন পিছন নোটিশ নিয়ে উপস্থিত হল পিয়ন। তখন আনন্দে মন ভরে উঠছিল। অবশেষে ২৮ দিন গরমের ছুটি দিলো।

ছুটির কয়েকদিন প্রকল্প নিয়ে কেটে গেল। তারপর ঠিক করলাম কোথাও একটা ঘুরতে যাওয়া। মা-বাবাকে বলে চার বন্ধু মিলে চলে গেলাম সেই জলপাইগুড়িতে। ইচ্ছা ছিল এবার দক্ষিণ ভারতের কোথাও একটা মন্দির দেখতে যাব। বাবা রাজি ছিল কিন্তু মা রাজি না হওয়ায় সেই জলপাইগুড়িতেই ঠাঁই নিতে হল।

বাসে করে শিয়ালদহ তারপর ট্রেনে সোজা জলপাইগুড়ি জংশন। আগেই বাবা হোটেল বুক করে দিয়েছিল তাই ট্রেন থেকে নেমে সোজা হোটেলে। সেই দিনটা তেমন ঘোরা হল না। তারপর দিনে সকালে উঠে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে ঘুরতে বেড়িয়ে গেলাম। ফিরতে বেশ রাত হল। তাই ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বাইরে সবাই খেয়ে এসেছিলাম তাই রাতে আর কিছু খায়নি।

দক্ষিণ দিকের জানালার পাশে ঘড়ির কাটার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে লাগল। মাঝরাতে একটা অদ্ভুত নিশ্বাসের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ ডলতে ডলতে ঝাপসা চোখে দেখি একটা লিগলিগে কালো বর্ণের বাচ্চা দাড়িয়ে আছে। আর ঘড়ির নীচে দিকে আঙ্গুল দিয়ে আছে। আমি লাইট জ্বালাতেই তা আর লক্ষ্য করা গেল না। আমি তখন তেমন ভয়ের আভা পায়নি।

তারপরের রাত্রে সেই দৃশ্য আবার চোখে পড়ল। আমি তখন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম পাশে শুয়ে থাকা জাকির জেগে গেল আর পাশের বিছানায় শুয়ে থাকা ইয়ানুর ও একরামূল শব্দ শুনে উঠে গেল। আমার এমন অবস্থা দেখায় একরামূল পাশের থাকা বোতলে করে জল দেয়। সেটি পান করার পর আমি সবটা বললাম। কিন্তু তারা সেই ব্যাপারটা হাস্যকর মনে করেন।

পরদিন সকাল বেলায় ম্যানেজারকে বলায় তিনি পুরো ব্যাপারটাকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তার চোখে মিথ্যার ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সেই দিনটা চা বাগানে ঘুরতেই গেল। অবশেষে রাতের আগমন হওয়ার আমি আবার রুমে শুতে গেলাম। কিন্তু আমি ঘুমাইনি। অপেক্ষা করছিলাম সেই দৃশ্যটা

পূনরায় দেখার জন্য। দেখি সেই বাচ্চাটা সেই দেওয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে কিছু একটা ইশারা করছে। ভয়ে ভয়ে তখনও শুয়ে ছিলাম কিন্তু ভয় মাত্রাধীন হওয়ায় আমি লাইট জ্বালাতেই সেটি আবার বিলীন হয়ে যায়। পরদিন ম্যানেজারকে জোর গলায় বললাম যে, এই হোটেলে কোনো বাচ্চা মারা গিয়েছিল কী না। অবশেষে সে স্বীকার করে বলে যে, অনেক দিন পূর্বে হোটেলে তিন তলায় ঐ রুমে দেওয়ালের কাজ করানো হয় তখন একটি রাজ মিস্ত্রির ছেলে কিছু টাকা চুরি করে। সেই জন্য তার বাবা কুন্নিক দিয়ে আঘাত করে মাথার পিছনে। আর সেখানেই সে মারা যায়।

সেই দেওয়ালের আঙুল দেওয়া স্থানটিকে ভাঙানোর জন্য আবেদন করি ম্যানেজারকে তারপর সেখানে কিছু খুচরা পয়সা দেখে আমরা সবাই হতমম্ভ। অর্থাৎ সেই বাচ্চাটি টাকা গুলো চুরি করেনি। খেলতে খেলতে ইটের ফাঁকে টাকা রেখে দেয় আর সেটি গাথনিতে আবদ্ধ হয়ে যায়।

বাবার ভুল ধারণার জন্য অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হল তার। আর সেই দিনের পর আমি কোনো রাতে তাকে আর দেখতে পেলাম না।

"If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the begining"
- Mahatma Gandhi

কালবৈশাখী ঝড়ের সেই রাত

সাব্বির মোল্যা
প্রথম বর্ষ

আজ যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা আসলে সত্য। আর সেই সত্যটা মনে পড়লে আজও আমার শরীর শিউরে ওঠে। মনে হয় নতুন একটা জীবন পেলাম। গল্পটা তাহলে প্রথম থেকে বলি। তবে গল্পটা বলার আগে জায়গার একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। আমাদের মাছ চাষের ব্যবসা। সবাই যাকে জলকর বলে। এই জলকরটা নন্দীগ্রাম, হলদিয়া এবং কাকদ্বীপের মাঝখানে একটি দ্বীপ। চারিদিকে গঙ্গা নদী। দ্বীপটার নাম নয়াচর। ভালোই বড় দ্বীপ। বাংলার বিভিন্ন জায়গার লোক বসবাস এবং ব্যবসা করে এখানে। না আছে ডাক্তার না আছে পুলিশ। কারেন্টও নেই এখানে। জলকর আর জলকর। গাছপালা দুই একটা আছে তা অনেক দূরে। এই রকম একটা জায়গাতে আমরা মাছ চাষ করে হলদিয়া, কাকদ্বীপ আর নিশ্চিন্তপুরে বিক্রি করি। এখান থেকে মাছ বিক্রি করতে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম নৌকা বা বোট। এই বোট গুলি টলারের মতো আকৃতি। বেশ শক্তিশালী। নয়াচর থেকে নিশ্চিন্তপুর ঘাটে যেতে লাগে দুই ঘন্টা। দিনে একবার নৌকা যায় আর একবার আসে। দ্বীপ থেকে নৌকা যায় সকাল সাতটায় আর নিশ্চিতপুর থেকে আসে বেলা বারোটার সময়। রবিবার আর বৃহস্পতিবার দুই বার বোট চলে মাছ বিক্রি করার জন্য।

মাস বৈশাখ, দিনটি ছিল রবিবার। আমি দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম তাড়াতাড়ি, মাছ বিক্রি করতে যাওয়ার জন্য। বেলা দুটোই বোট ধরে পৌঁছলাম নিশ্চিন্তপুর ঘাটে। সেখান থেকে রিক্সা করে যেতে হয় নিশ্চিন্তপুর মাছ আড়তে। তাড়াতাড়ি মাছ বিক্রি করতে হবে কারণ বোট ছাড়ার সময় রাত আটটা। সুতরাং মাছ বিক্রি করে বাজার করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘাটে এসেদেখি অনেক ভিড়। তার মধ্যে একটা জায়গা করে আমি বসে পড়লাম। ভিড় না থাকলে শোয়ার জায়গা টাও হয়ে যেত। একটু জল পিপাসা পাওয়ায় বোটের জলের পাত্র থেকে জল খেলাম। তখন জল সামান্য আছে। যাই হোক জল খেয়ে আবার বসে পড়লাম জায়গায়। বোট ছাড়লো ঠিক রাত আটটায়। আজ যেন হাওয়া নেই। অন্য দিনতো ভালো হয়। এই সব কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ বিশাল আকারের ঝড় উঠল। আর সেই ঝড়ে আমাদের বোটটা আছাড় খেতে লাগলো। এই বুঝি বোটটা ডুবে যায়। নৌকা তখন নদীর মাঝখানে। আমাদের বোটটা একবার জলের উপর উঠে যাচ্ছে আবার জলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তার উপর জোয়ারের বিপরীতে বোট যাচ্ছে। আমরা তখন বুঝলাম বড় বিপদ সামনে। কারণ মাঝি বিপদ বুঝে খুব চিন্তিত। মাঝে মাঝে এমন হচ্ছে বোট ভেঙে গেল গেল ভাব। তখন মহিলাদের আর্তনাদ, আর কান্নার আওয়াজ যেন এক বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি হল। আমি ভাবছি মরেও আজ যেতে হবে কিন্তু আমার দেহটা কোথায় কী হবে কে জানে?

এই সব কথা ভাবছি আর সৃষ্টি কর্তার কথা স্মরণ করছি। এমন সময় হঠাৎ এক মাছ ব্যবসায়ীর তিনটি মাছের হাঁড়ি ঝড়ে উড়ে গেল। কেউ কেউ বলল আজ কত কি যাবে তার ঠিক নেই। জীবন বাঁচলেই হল। মাঝি স্থির করল বোটটা লঙ্গড় দিয়ে মাঝখানে রেখে দেবে। কারণ নৌকা এগোচ্ছেনা। তার উপর ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। ভাবছি এমন সময় যদি ইঞ্জিনটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে বাঁচার আশা আর থাকবে না। মাঝি লঙ্গড় ফেলল জলে। কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। ষাট কেজি ওজনের লঙ্গড়, কাঁচি সহ নদীতে চলে গেল। করার কিছু নেই। মাঝি তখন আরও চিন্তিত। আমার তখন আর চিন্তা নেই। কারণ চিন্তা করে লাভ নেই। কি হবে মেনেই গেছি। মহিলাদের কান্না, মাঝির চিন্তা আর ঢেউয়ের ধাক্কা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর কথা। তার উপর হঠাৎ বৃষ্টি এল। বৃষ্টির জলে সারা শরীর ভিজে। আর ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় প্রচন্ড শীত লাগতে শুরু করল। যাকে বলে বিপদের উপর বিপদ। ভাবলাম কটা বাজে দেখি। কিন্তু সময় দেখার কোনো উপায় নেই। এই সময় বোটটা কোথায় আছে কে জানি? চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কিনারা দেখা গেল। আমাদের তো আনন্দে স্বর্গ হাত। মাঝি খুব কষ্টে বোট ধারে নিয়ে গেল। ধারে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের বোট সেখান থেকে ছেড়েছিল সেখানে পৌঁছে গেছে। যাই হোক কিনারাই পৌঁছে গেছি এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে? তখনও বৃদ্ধ থেকে যুবক সবাই শীতে কাঁপছে। ঘড়িতে তখন রাত দশটা। খিদে পেয়েছে খুব। খাওয়ার কিছু নেই। পকেটে পাঁচ হাজার টাকা। ভাবলাম টাকার কোনো দাম নেই আজ। ঘাটের দোকানিরা দোকান বন্ধ করে চলে গেছে। এদিকে আমার শীতও করছে। হাওয়া এখনও বন্ধ হয়নি। অবশেষে খিদে চেপে রেখে নৌকার ভিতর ইঞ্জিনের পাশে বসে পড়লাম। এখানে ইঞ্জিনের গরমে জায়গাটা বেশ গরম। আমাকে দেখে আর পাঁচজন এখানে এসে বসল। এখন সবাই খিদেয় আর শীতে কাবু। সবাই সামান্য খাদ্যের জন্য বেশি টাকা দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু খাবার পাওয়া মুশকিল। একজন বলল - ' ভাইপো কিছু জোগাড় করতে পারিস কি দেখনা ! বেশি টাকা দেব' হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার ব্যাগে এক কেজি চিড়ে আছে। কিন্তু ব্যাগটা উপরে। আমি বললাম আমার কাছে চিড়ে আছে। কিন্তু উপরে। লোকটি বলল 'কত নিবি বল'। আমি হেসে বললাম - টাকা লাগবে না। লোকটি বলল - 'তাহলে নিয়ে আয়'। আমি উপরের লোকগুলোকে বলতে যাব এমন সময় একটি লোক বলল - 'ব্যাগে চিড়ে আছে কাউকে বলো না।' আমি উপর থেকে ব্যাগটা চাইলাম। চিড়ে ভিজবার উপায় নেই। কারণ বোট ছাড়ার সময় যখন জল খেয়েছিলাম তখন জল অল্প ছিল। এখন জল নেই সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা ছজন শুকনো চিঁড়ে খেয়েছিলাম। চিঁড়ে গলায় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার নেই। কিছুক্ষণ পর হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। মাঝি বোড ছাড়লো। তারপর কখন আমার ঘুম সে গেল জানি না। ঘুম ভাঙল মাঝির ডাকে 'রাত তখন দুটো' দেখি বাবা তখনও জেগে। আমি সব ঘটনা বলার পর বাবা বলল ওটা কালবৈশাখী ঝড়। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।

রহস্যময়, ভয়ঙ্কর, মায়াবী ও আত্মহত্যার জঙ্গল ঃ অওকিগাহারা

মহিবার রহমান
কম্পিউটার পারসোনেল

"আত্মহত্যা করার জন্য দিনটা খুব ভালো। // আকাশে পূর্ণিমা নেই, নেই, নেই ঘুটঘুটে আমাবস্যা।// নেই মন আওড়ানো বাতাস, নেই ওই কালো শালিকটার ডাক। // চমৎকার এই দিনটিতে স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে অনায়াসে ম'রে যেতে পারি, // বক্ষে ঢোকানো যায় ঝকঝকে উজ্জ্বল তরবারি, কপাল লক্ষ্য করে টানা যায় অব্যর্থ ট্রিগার, // যে-কোনো একটি দিয়ে আত্মহত্যা করে যেতে পারি....
— কবির এই কবিতাটি জাপানের একটি অদ্ভুত অরণ্যে যেন বাস্তব রূপ লাভ করে।

আমাদের পৃথিবীতে কতইনা রহস্যময় স্থান রয়েছে যা আমাদের প্রতিনিয়তই ভাবিয়ে তোলে, আর আজকে আমি আপনাদের নিয়ে যাব এমনই এক রহস্যের কিনারায় যেখানে কেবল ভুতুড়ে, মায়াবী আত্মহত্যার হাতছানি।

জাপানের ফুজি পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ৩৫ বর্গ কিলোমিটার একটি জঙ্গল অওকিগাহারা (Aokigahara)। মাউন্ট ফুজির পাদদেশ এবং টোকিও শহর থেকে থেকে ১০০ মাইল পশ্চিমে এটি অবস্থিত। নাম না জানা অদ্ভুত সব পাথর আর বরফের গুহা দ্বারা সমৃদ্ধ শুন-শান নিরব এই সুবিশাল বনটি এক রহস্যময় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। এখানকার গাছপালার ঘনত্ব ও উচ্চতা এত বেশি যে, এর মধ্যে কেউ একবার প্রবেশ করলে নিশ্চিত পথ হারিয়ে ফেলে। গা-ছমছমে সেই হনশু দীপে অবস্থিত বনটি যেন আলো-আঁধার ও মৃত্যুর নিবিড় সখ্য। ঘন গাছপালার জন্য এক কেউ বলে 'বৃক্ষ সাগর' আবার কেউ বলে 'শয়তানের বন'। স্থানীয় দের কাছে এটি 'জুকাই' নামে পরিচিত, স্থানীয়দের ভাষায় 'জুকাই' শব্দের অর্থ 'গাছের সমুদ্র'। তবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত 'আত্মহত্যার বন' বা 'Sucide Forest' নামে। এই বনটির নেপথ্যের কথা জানলে সকলেই অবাক হতে হয় যে, এখানে মানুষ আসে একমাত্র আত্মহত্যা করার জন্য। যদিওবা কিছু কিছু ব্যক্তি এখানে আসেন তদন্ত মূলক কাজ করতে তবে বেশিরভাগ উদ্দেশ্য আত্মহত্যা। এ বনটি জাপানিদের কাছে আত্মহত্যার সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা। আত্মহত্যার জন্য সমগ্র বিশ্বে এর স্থান দ্বিতীয়, আমেরিকার সান ফ্রন্সিসকোর 'গোল্ডেন ব্রিজ'-র পরেই এর স্থান।

উনবিংশ শতাব্দিতে এখানে ''উবাসুতে'' নামক এক অদ্ভুত রীতি পালন হত। এর মাধ্যমে জাপানিরা তাদের বৃদ্ধা মহিলাদের এই বনে ফেলে যেত যাতে তারা এখানেই থেকে মারা যায়। এবং সন্তানেরা যাতে ভালো ভাবে থাকতে পারে সেই আশায় তারা আত্মাহুতি দিত। জাপনি পুরাণ মতে, এ বনে সর্বদা তাদের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়, স্থানীয়দের মতে এই বনের মধ্যে কেউ একবার প্রবেশ করলে তার হৃদয়ে এমনই এক মায়ার সৃষ্টি হয় যে সে আর ফিরে আসতে পারে না। তারপর একসময় তার অতীতের হৃদয় বিদারক সব কাহিনী গুলো একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে অবশেষে

সে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে নিজেই শেষ করে দেয়। এমনকি জাপানিরা এই জায়গাটিকে অভিসপ্ত স্থান মনে করে ফলে অনেকেই এই জায়গায় আসার সাহস করে না। যার কারণেই আজও জায়গাটা রহস্যময় রয়ে গেছে। মানসিক অবসাদ ও রীতি-রেওয়াজের মাখামাখিতে অদ্ভুত এক অনুভূতি যা মুষড়ে পড়া মানুষের হৃদয়ে অন্য মাত্রা এনে দেয়।

বর্তমানে এই বন থেকে প্রতি বছর উদ্ধার হয় প্রায় একশ'র বেশি মৃতদেহ। এই আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মার্চ মাসে। এদের বেশির ভাগই হয় ফাঁসিতে ঝুলে কিংবা মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনে মারা যায়। ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫ শ'র বেশি জাপানি এখানে আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৯৮ সালে ৭৪ জনের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয় এখান থেকে। ২০০০ সালে ৭৮ জন, এর পর ধীরে আত্মহত্যার হার বাড়তেই থাকে। ২০০৩ সালে আত্মহত্যার হার বেড়ে ১০০ পেরিয়ে গেলে জাপানি সরকার দ্বারা আত্মহত্যার হার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে সমীক্ষা থেকে জানা যায় ২০১০ সালে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ২৪৭ জন আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয়। তার মধ্যে ৫৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১৯৯ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১০০-র বেশি মানুষ এই বনে এসে আত্মহত্যা করে। ধারনা করা হয় যে, ১৯৬০ সালে সাইকো মাটসুমোটো (Seicho Matsumoto) নামক এক জাপানি লেখকের "কুরোই জুকাই" (Kuroi Jukai : Black Sea of Trees) নামক একটি উপন্যাস প্রকাশ করার পর থেকেই এখানে এসে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই উপন্যাসে এক প্রেমিক চরিত্র এই বনে এসে আত্মহত্যা করেন।

১৯৭০ সালে পুলিস, স্বেচ্ছাসেবক ও সাংবাদিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছিল যাদের কাজ ছিল মৃত দেহগুলি খুঁজে বের করা ও লোকজনদের আত্মহত্যার অনুৎসাহিত করা। এখনো তারা কাজ করে যাচ্ছে। পুরো বন জুড়ে যতদূর সম্ভব জাপানি ও ইংরাজি ভাষায় আত্মহত্যা না করতে ও প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। স্থানীয় সরকার কঠোর ভাবে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। তবু না জানি কীসের টানে আজও মানুষ সেখানে গেলে আর ফেরে না ! অবসাদের তিক্তানলে আহূতি দিতে আজও মানুষ অদৃশ্য মায়ার টানে ছুটে যায় সেই অভিশপ্ত অওকিগাহারায়।

"Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world.
- Nelson Mandela

এসো হে নূতন

সুজয় পাল
প্রথম বর্ষ, (বাংলা অনার্স) রোল- ৪৫৮

চৈত্র দিন তব বসন্ত ছিন্ন করে
বৈশাখও প্রহরে গ্রীষ্ম কড়া নাড়ে,
যদিও মোরা নই রৌদ্র দগ্ধ ক্লান্ত
নূতন রবি রশ্মিতে দেখায় দুই চক্ষু দিগন্ত।

হাজারও স্মৃতি মধ্যরাতে হারিয়ে গিয়ে
নিলক্ষর নীলে স্থির হয়ে।
সকালে শীতল আলিঙ্গনে
অতীতকে বিসর্জন দিয়ে ;
আবারও ভেসে যাব নদীর স্রোতে
অজানা গন্তব্যের পথে।

এ হেন বৈশাখও প্রজাপতি উড়ে !
একটু গানের সুরে
গুরুকে স্মরণ করে
এ কবি মন উড়ে যেতে চায় নূতন ভাবে।
হৃদয় অন্তরে,
বাঁধাধরা আঙ্গিকের বাঁধন ভাঙ্গিয়ে
আকাশেতে সাত রঙারঙ রাঙিয়ে,
কবির সুরে অন্তর বলে ওঠে
এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ

দাবি

মোঃ সাহিন আলম
প্রথম বর্ষ, (শিক্ষা বিজ্ঞান অনার্স) রোল- ৩৩৩

পাইনি যেসব জীবনেতে, তা নিয়ে আজ ভাবি,
অনেক কিছু পাওয়ার ছিলো, করিনি তো দাবী।
করলে দাবী, পেতাম কিনা, ছিলোনা তাও জানা,
হয়ত পেলে উসুল করে,
নিতাম ষোলো আনা।
ভাগ্য যদি থাকে, তবে করতে হয় না দাবী,
পাওয়ার হলে, এমনি পেতাম
এটাও আবার ভাবি। কপালে যা আছে লেখা
সেটুকু পাবো জানি,
যে যাই বলুক কপাল টাকে
আমি ভীষণ মানি।

"নারী"

জেসমিন নাহার পারভীন
প্রথম বর্ষ, (ইতিহাস অনার্স) রোল- ৩০

মানুষ কেন বলে মোদের
নারীর নিজস্ব নাই কিছু।
আমি তো দেখি জগৎ চলে...
নারীর পিছু পিছু।।

বাপের ঘরে লক্ষ্মী আমি...
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
ছেলের ঘরে জননী আমি
আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা।।

আমার থেকে আপন করতে..
আর কি কেউ পারে?
বাপের ঘরকে ছেড়ে এসেও...
পরকে বাঁধি ঘরে।।

গোত্র থেকে গোত্রান্তর...
যদিও আমি হই।
তবুও যেন জননী রূপে...
সকল দুঃখ সই।।

ভারতমাতা সেও নারী...
নারী জগদ্ধাত্রী।
নারী হল এ জগতের...
সবার জন্মদাত্রী।।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই...
পুরুষকে বড় করে।
জেনো রেখো সেই পুরুষকেই,
'নারী'... গর্ভে ধারণ করে।।

মহাকাল আমার পদতলে...
শায়িত চিরকাল।
আমি ছাড়া এ জগৎ-সংসার,
সবই হবে অচল।।

"Confidence and Hard-work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make u a successful person"
- APJ Abdul Kalam Azad

কলঙ্কিত শিক্ষা

ইনজামামুল হক গাইন
প্রথম বর্ষ, (আরবী অনার্স) রোল- ১৪৭

কষ্ট গুলো লজ্জার মোড়কে ঢেকে,
এক জ্ঞান দানকারী পথ প্রদর্শক নিজেকে আড়াল করে।
তার আজীবন লালিত শিক্ষার চারণ ভূমি বর্গীদের দখলে।
সেই অনাহুত কষ্ট বুকে চেপে এই জঙ্গলে
ঘেরা ধরার বুকে আজও বেঁচে।।
সার্বভৌমত্বের পর থেকেই শিক্ষার মন্ত্র পাঠ রত ছিল যে,
তাঁর আর্দশ গেঁধে দিতে কত না তপস্যা কত শস্য
ফলাল শিক্ষার মাঠে।।
বলেছিল প্রিয় সন্তান সম শিক্ষা যাত্রী,
এই দেশে তোমার আমার সকলের প্রাণ প্রিয় অতি।
তোমরা তৈরি হও গড়ে তুলবে নতুন স্বপ্ন আশা,
বুকে নিয়ে সুদিনের।।
আজ সারা বাংলার এপ্রান্ত থেকে সে প্রান্তে সেই সব শিক্ষার্থী,
বড় হুকুম দাতা, নেতা, আমলা, বড় অফিসের মত কেউবা মন্ত্রী।
তাঁর দেয়া শিক্ষার জ্ঞান উল্টো পথে করছে প্রয়োগ,
নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দেশ মাতৃকা, করছে অন্যায়
ভাবে দখল ভোগ।
অন্ধত্ব ভাল ছিল, দুই কান বধির হলে ক্ষতি কি ছিল?
জরাক্রন্তে যত না ক্লান্ত তার চেয়ে বেশি ক্লান্ত বেশি
তাঁর গড়ে তোলা দুর্বৃত্তের কাজ কর্মে।
সমাজের অন্যায় বলাৎকার স্বৈরাচার ভূখন্ড দখলদার
সব সবই তাঁর তৈরি শিক্ষার্থী করছে নির্দ্বিধায়।
এই অরাজকতার দিনক্রান্তিতে সে নিজেকেও করে দায়ী!
হয়ত ভুল ছিল জ্ঞানদানে, ভুল ছিল শিক্ষার স্বরিধী।।

নারী-কথা

ফারহানা পারভীন
প্রথম বর্ষ, (ভূগোল অনার্স) রোল - ৫

ও-গো নারী, তুমি তো বড়োই অসহায়
তোমার স্বপ্ন, ইচ্ছা সখ
কিছুই যে থাকার অধিকার দেয়নি এই সমাজ।
কারম, তুমি তো নারী, মানুষ তো নও
নিজের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে
যখনই হয়েছ প্রতিবাদী
পরাধীনতার শিকল ভেঙে যখনই বেরিয়ে আসতে চেয়েছ
এই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ
তোমাকে কলঙ্কিত করেছে
তাহলে, সহনশীলতাই কী নারীর ধর্ম?
প্রতিবাদী হলেই কী নারী ঘৃণ্য?
আচ্ছা, কখনও কী এমন হতে পারে না,
যখন এই সমাজই দেবে নারীর পূর্ণ মর্যাদা,
সম্মানিতা হবেন প্রকৃত
নারী বলিয়া।

অর্থহীন জীবন

সৌরভ ঘোষ
প্রথম বর্ষ, (বাংলা অনার্স) রোল- ৪৭৬

জীবনের অর্থ খুঁজ আজ আমি
একাকী নিরালায় বসে
হৃদয়ের আবেগ আর
মস্তিকের চেতনার স্রোতে।
অস্থির চঞ্চল মন
লক্ষহীন পথিকের মতো।
কতবার পার হয়ে এসেছি
আজও মনে পড়ে সেই কথা।
জীবনের গতি আজ থেমে গেছে
এই সাদা মাটা জীবনে,
ছুটে যায় না মন আজ নতুনের সন্ধানে।
পৃথিবীর ক্লান্তি নাই
গতি তার চলমান সদা কিন্তু
মন থেমে আছে যে মনে
শূন্য কিছু রবে না তো জানি
আমি আজও অপেক্ষায় থাকি।।

স্রষ্টা

সুব্রত সরদার
প্রথম বর্ষ, (ইতিহাস অনার্স)
রোল- ৬২

বায়ু বলে আমি সব
জল বলে আমি
আলো বলে আমি কে হে?
মাটি বলে আমিই ভূস্বামী।
প্রকৃতি বলে,
আমি বিনা তোরা সবাই যে অচল,
ভূমি বলে,
আমি বিনা থাকিবে না ভূতল।
আলো বলে,
আমি বিনা পাবি নাকো দেখতে,
বায়ু বলে,
আমি বিনা পারবি না বাঁচতে।
জল বলে,
আমি বিনা মিটবে না তেষ্টা,
ভূমি বলে,
আমিই যে পৃথিবীর স্রষ্টা।
জল বলে,
আমিই বিনা হবে নাকো শস্য,
আলো বলে,
আমি বিনা জগৎ বিভৎষ্য।

"প্রাণ বায়ু ছুটে যায় নেই যার অন্ত
জলধারা ছুটে যায় দূরদিগন্ত।
ভূমি বিনা পৃথিবীতে চলাচল বন্ধ
আলো বিনা পৃথিবীতে সবাই যে অন্ধ।
প্রকৃতি বলে,
'ওরে ভাই ভুলে যাই এ সকল দ্বন্ধ
একত্রে না থাকিলে পাবি না আনন্দ।

"One child, one teacher, one pen and one book can change the world."
- Malala Yousaf Zai

উচ্চাকাঙ্খা

গৌতম বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ, (ইংরাজী অনার্স)
রোল-৫৪

ম্যাকবেথ হে গ্লেমস, হে বীর পুরুষ
তোমার দেখে ডরে কত যে মানুষ
রাজার নয়নমণি তুমি, প্রজার বীর সেনাপতি
লড়িয়ে নিজের প্রাণ, দাওনা হতে দেশের ক্ষতি।

কিন্তু কখনো কি ভেবেছ নিজের কথা
যা পেয়েছ তুমি তাই কি তোমার পাওয়ার কথা?
রাজা-বুড়ো ডানকান, আছে কি তার সেই ক্ষমতা
যে সামলাবে এই সুবিশাল দেশটা?

বুড়োর বড়ো ছোড়া - নাম তার ম্যালকম
সত্যিই তার মধ্যে রাজা হবার গুণ কম।
রইল পড়ে ছোট্ট শিশু ডোনাল
ওই নাকি ধরবে এই দেশের হাল?

এই তো, এই তো পেয়েছি সুযোক এবার
আসছে রাজা স্বয়ং দুর্গে আমার
সত্যি হবে অধরা স্বপ্নটা আমার
উক ! কুরে কুরে খায়সে বার বার।

কিন্তু কি করে শুনি তোর কথা?
সে যেন আমার নিজের পিতা
যে রক্ত বইছে শরীরে তার
সেই রক্তই তো বইছে শরীরে আমার।

তাছাড়া আজ এ রাতে সে অথিতি
আর সেবক হয়ে আমিই কিনা করব ক্ষতি
প্রজা হয়ে করব রাজহত্যা
না না ! আমি কখনো পারি না তা।

ম্যাকবেহা, তুই হলি বড্ড বোকা
সোজা আঙুলে ঘিনা উঠলে আঙুলটা একটু বাঁকা
আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন তোমার, অথচ তুমি সাধু
এ জগৎে কোনো কিছুই পাবে না সহজে চাঁদু

যা যা - এক্ষুনি ছুটে যা
তুলে নে ওই ধারালো ছোরা টা।
টুক করে শুধু মারবি একটা খোঁচা
ব্যাস, ডানকান চিৎপাত, তুই হবি রাজা।

কবিতা লেখার চেষ্টা

জিসান মোল্যা
প্রথম বর্ষ, (ইংরাজি অনার্স)
রোল- ৩৬৬

ভেবেছিলাম লিখবো না ম্যাগাজিনে
সেলিমা রোজ বলে
লেখাটা দিলি না এতদিনে।
আমি ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি না পারি কিনা!
ছোট একটা কবিতাই তো কেন বা হবে না।
নিজেকে প্রশ্ন করি বার বার
ইংরেজির ছাত্র হয়ে বাংলায় কবিতা লিখব এবার?
তা চেষ্টা করে দেখি না
যদি একটা পারি লিখতে মন্দ হবে না।
বসে পড়লাম খাতা আর কলম নিয়ে
ভাষা-টাসা আসছে না যে মাথা দিয়ে।
লিখতে লিখতে পৌঁছে গেলাম এক যে রাজ্যে
ভাবি মনে প্রকৃত মানুষ হওয়াই আসল কাজ যে।
সে দিন হবে আমার স্বপ্ন সাকার
মানুষ হয়ে স্বার্থ ছাড়া পাশে থাকব সবার।

"All creative people want to do the unexpected"
- Hedy Lamarr

শিক্ষা আমার অধিকার

কবির আলি মোল্যা
প্রথম বর্ষ, (শিক্ষা বিজ্ঞান অনার্স)
রোল- ১৮০

মায়ের কাছে গিয়ে
বলবো আমি আজ
মাগো দাও করিয়ে সাজ,
আমি স্কুলে যাবো আজ।
শিক্ষা মোদের অধিকার,
শিক্ষা মোদের বুকের বল,
শিক্ষা মোদের ঢাল তরোয়াল।
জীবন যুদ্ধে বাঁচতে গেলে,
শিক্ষা ছাড়া গতি নায়।
মাগো দাও করিয়ে সাজ,
আমি স্কুলে যাবো আজ।
শিক্ষা মোদের অধিকার,
সবাই বল বার বার।

হ্যাঁ ! আজ বড্ড অভাব আছে।

প্রভাস দাস
প্রথম বর্ষ, (ইংরাজী অনার্স) রোল- ৪০৪

Macbeth সেদিন Macduff -এর সঙ্গে যুদ্ধ মারা গেছে,
না !
সে জীবিত ; প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সে জীবিত।
হ্যাঁ !
আজ Macbeth -এর অভাব নাই —
কিন্তু অভাব আছে !
অভাব আছে Macduff -এর।
Macbeth যেমন রাজার সিংহাসনের লোভে -
তার পথের বাধা গুলিকে হত্যা করতে চেয়েছে,
আজকের মানুষও তেমন -
স্বস্বার্থের জন্য অপরের ক্ষতি করতে একদম -
ভুল করে না।
সত্যিই অভাব আছে !
কে বলেছে ; এখন Witches -দের আর -
দেখা যায় না। হ্যাঁ !
দেখা যায় ; তবে বহুরূপে তারা বিরাজমান,
এখন তাদের কে আর চেনা যায় না।
কারণ ! এখন গুলিয়ে যায় কে Witch - আর কে Sweet.
যারা অন্যের ক্ষতি সাধনে আনন্দ পায়,
আর অন্যের ভালোতে তারা কষ্ট পায়,
fair তাদের কাছে foul এবং foul তাদের -
কাছে fair,
ঠিক তেমনিই আজকের সমাজের মানুষ।
হ্যাঁ ! সত্যিই অভাব।
হ্যাঁ, সত্যিই একজন Macduff -এর অভাব
আজ রয়েছে।
হ্যাঁ, সত্যিই Honesty, Morality -র
বড্ড অভাব আজও রয়ে গেছে !!!!!!!!!!

নারী

পম্পা গাইন
প্রথম বর্ষ, (ইতিহাস অনার্স)
রোল- ১৩১

নারী কেন এত ভয়
নারী তুমি করবে জয়।
বিশ্বজগৎ থেমে আছে তোমার অপেক্ষায়
হে নারী জেগে ওঠো
ঘুমিয়ে থাকবে কত
সময় যে বয়ে যায়।
জগৎ যে থেমে থাকে
তোমার অপেক্ষায়।
এই সমাজ ও মাতৃভূমিকে নিয়ে
যাও উচ্চ শিখরে।
তুমিই পারবে অন্ধকার জীবনটা
উজ্জ্বল করে তুলতে।
হে নারী আমরাই পারি।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

মহিমা খাতুন
প্রথম বর্ষ, রোল- ১৫৬২

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
মোদের মহাবিদ্যালয়।
পড়াশুনা শিক্ষা দীক্ষায়
করেছে সবার মন জয়।
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়টি মোদের
তিন তলা ভবনটি সুন্দর।
সাজানো গোছানো প্রত্যেকটা
মোদের ক্লাস এর অন্দর।
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের চারিপাশে
সুন্দর করে ঘেরা।
শিক্ষা দীক্ষায় নানা বিষয়
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় যে সেরা।
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়টি কে নিয়ে
মোদের গর্ব রাশি - রাশি।
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়কে
আমরা সবাই বড়ো ভালোবাসি।

"If we want to reach real peace in this world, we should start educating children" - Mahatma Gandhi

স্বাধীন নারী

কোয়েল সরদার
প্রথম বর্ষ, (ইতিহাস অনার্স) রোল- ৩৩৮

নারীদের সব ইচ্ছেগুলো মনের মাঝে থাকে,
ইচ্ছে হলেই ইচ্ছেগুলো দেয় না ধরা তাকে।
ইচ্ছে পূরণ করতে চাইল সমাজ দাঁড়ায় রুখে,
বলে তোমরা নারীজাতি, ঘরেই থাকো সুখে।
নারীরা কি ফেলনা এতই? থাকবে পুরুষাধীন?
আর কতকাল থাকবে নারী
পুরুষেই অধীন?
সমাজ এখন বদলাচ্ছে, নারী এখন স্বাধীন
নারী এখন একাই একশো নিজেই নিজের অধীন
অনন্তকাল শাসন-শোষণ মুখ বুজে সব সয়ে,
নিচ্ছে নারী তার প্রতিশোধ, সেই সেকালের হয়ে।।

বিবেকানন্দ

নাসিম ইকবাল
তৃতীয় বর্ষ, রোল- ১৮৪

ভারত মাতার গর্ব তুমি
তুমিই মহান বীর।
তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে
বিশ্ববাসীর ভীড়।
তুমিই সবার হৃদয় মাঝে
প্রেরণায় সাথি।
জীবন মাঝে তোমায় রেখে
আনন্দে মাতি।

মা

কবির আলি মোল্যা
প্রথম বর্ষ, (শিক্ষা বিজ্ঞান অনার্স), রোল- ১৮৪

মা আমার অতি ভাল,
আমারে দেখাইছে মা পৃথিবীর আলো।
অনেক কষ্ট দিয়েছি মায়ের মনে,
কখনো কেঁদেছে মা আমারই কারণে।
কাউকে জানায়নি তাঁর মনে কষ্ট,
তাইতো মা আমার কাছে সবার শ্রেষ্ট।
মা আমাকে দেয় উপদেশ,
গুরুজনের শুনিস আদেশ।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম

সুমন পাল
দ্বিতীয় বর্ষ, (বাংলা অনার্স)

মাতৃভাষা মানে মহিমা
সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য বোধ।
ভাষার এই সুরেলা ধ্বনি
আজও কারও বুকে বিধছে না।
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
তাই কেউ আর বলছে না।

মাতৃভাষার মর্মার্থ
বুঝেছিল শুধুই শহীদেরা,
আমরা তো উপলক্ষ্য মাত্র।
বাঙালী তুমি আজও মেকির আবরণ ছাড়লে না!
তাই কেউ আর বলছে না।

বাঙালী তুমি আজও বোঝনি
বিপদ তোমার দ্বারে।
হিন্দি তো আমাদের গ্রাস করেনি
করেছে মাইনে করা চাকরে।

ভাষা প্রেম থাকতে হয় দৃঢ় মনোবলে,
বাঙালী তুমি তা উপলব্ধি করলে না।
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
তাই কেউ আর বলছে না।

মাতৃভাষা ঠিক কী?
মাঝির গোচরেও তা অস্ফুট।
তিনি ও যে আজ ...
ইংরেজির টিপটপে রত,
কণ্ঠে তার আর ভাটিয়ালি মেলে না।
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
তাই আর কেউ-ই বলছে না।

আজব পরীর দেশ

সঞ্জিতা সরদার
প্রথম বর্ষ, (সংস্কৃত অনার্স) রোল- ২১৬

এক যে ছিলো পরীর দেশ
থাকতো সেথায় পরীরা বেশ।
নীল পরী আর লাল পরী
মস্ত তাদের লম্বা কেশ।
সে দেশ ভারী আজব দেশ
বর্ণনা তার নাইকো শেষ।
চাঁদের আলোয় তারা হাসে
মেঘের কোলে বৃষ্টি ভাসে।
তাদের মাঝে সূর্য দোলে
আকাশ ওদের নিয়ে চলে।
এমন দেশে পরী থাকে
নানান রঙের ছবি আকে।

মা

পল্লবী মন্ডল
প্রথম বর্ষ, (ইতিহাস অনার্স) রোল- ১৫৫

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জানো ভাই
মায়ের মতো নামটি মধুর
এই পৃথিবীতে নাই।
মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে
হই যে দিশেহারা,
মা যে আমার দূর আকাশের
ছোট্ট শুকতারা।
মা যে আমায় ঘুম পাড়াতো
দোলনা ঠেলে ঠেলে,
শীতল হতো বুকটা আমার
মায়ের পরশ পেলে।
মা যে আমায় করত আদর
বাসত কত ভালো
মায়ের জন্য দেখলাম আমি
এই পৃথিবীর আলো।

আমার কলেজ প্রীতি

রোহিনা পারভীন
প্রথম বর্ষ, রোল- ১১০৫

বছর কয়েক মিলেমিশে, কলেজে পড়তে এসে,
কত আড্ডা কত আনন্দ, সবাই কে ভালোবেসে।
জ্ঞানের আলো সাথে নিয়ে যায় সে সবাই ফিরে,
তবুও ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের স্মৃতি, থাকবে জীবন ঘিরে।
কত কত অন্যায় কত কত ভূল, করে গিয়েছি কতদিন,
কলেজ থেকে যা কিছু পেয়েছি, শোধ হবে না তার ঋণ।
জীবনে চলার পথ দেখিয়ে করেছে যারা ধন্য,
কী রেখে গেছি কী দিয়েছি আমরা তাদের জন্য।
হিংসে নয় রাগ নয় গাইবো জয়ের গান,
এরই মধ্যে থেকে গেছে ভালোবাসার টান।
অবশেষে এই কথাটি বলতে আমি চাই,
কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ভালো থেকো সবাই।

আরম্ভ

দিলবার হোসেন
বি.এ জেনারেল, রোল- ১০৫২

শুধু হারাতেই শেষ নয় থাকে জেতার আকাঙ্খা
সবাইকে হারাবার আরম্ভ।
শুধু দুঃখেই শেষ নয় চলে সুখের প্রতীক্ষা
হয় সুখের আরম্ভ।
অপমানেতেই শেষ নয় থাকে মানের বীজ তাতে
হতে পারে সম্মানের আরম্ভ।
ভয়েতেই শেষ নয় ভয়ের শেষটাতে
হয় সাহসের আরম্ভ।
শুধু ভাঙাতেই শেষ নয় সে যে নির্মানের অবকাশ
হয় নির্মানের আরম্ভ।
জেনো ঘৃণাতেই শেষ নয় তা ভালোবাসার পূর্বাভাস
তা ভালোবাসার আরম্ভ।
খারাপেই শেষ নয় থাকে ভালোও মিশে তাকে
করো ভালোর আরম্ভ।
মরণেই শেষ নয় বাঁচতে শেখো আগে
করো নব জীবনের আরম্ভ।

আমার ইচ্ছা

মহিমা খাতুন
প্রথম বর্ষ, রোল- ১৫৬২

লেখাপড়া শিখবো আমি
কিনবো নাকো গাড়ি।
করবো নাকো আকাশ ছোঁয়া
মস্ত বড়ো বাড়ি।
সবার সুখে হাসবো আমি
কাঁদবো সবার দুঃখে।
নিজে খাবার বিলিয়ে দেব,
অনাহারের মুখে।
সবার পাশেতে দাঁড়াবো আমি
করব নাকো কাউকে পর।
হিংসা ঘৃণা ভুলে গিয়ে
করবো সবারে আপন।
সত্যের পাশে দাঁড়াবো আমি
সত্যকে করব জয়।

আমার মা

রোহিনা পারভীন
প্রথম বর্ষ, রোল- ১১০৫

মিষ্টি আমার মায়ের মুখ যেন পূর্ণশশী,
তাইতো আমি সবার চেয়ে মাকে ভালোবাসি।
হৃদয় মাঝে পুষ্প বনে খুঁজি মায়ের মন,
মায়ের জন্য দিতে পারি অমূল্য জীবন।
মায়ের মতো পৃথিবীতে আর যে কেহো নাই,
তাইতো মাকে সারাজীবন কাছে রাখতে চাই।
মায়ের হৃদয় কোমল হৃদয় অনের করুণা,
সেই মায়ের বুকে আমি আঘাত দেবনা।
মা যে সবার পরম গুরু জগতে দেয় আলো,
তাই শুভদিনে সবার আগে দিও মাগো
তোমার পায়ের ধুলো।

আমার ইচ্ছে

খাদিজা খাতুন
প্রথম বর্ষ, (দর্শন অনার্স) রোল- ১১১

ভাবতো যদি এমন হতো
এই বয়সটিকে থামিয়ে রেখে, কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়ে
ছোটো বেলায় ফিরে গিয়ে, সাজিয়ে নিতাম নিজেকে
খুশি মনে মনে।
ভাবতো যদি এমন হতো,
সবার আদরের পুচকি মেয়ে আমি, সবার কোলে কোলে
খিদে পেলেই খাওয়া দিতো, কতো মজা মনে।
ভাবতো যদি এমন হতো।
পরিবারের সবচেয়ে ছোট্ট মেয়ে আমি
আমার মুখটি সবার সম্মুখে থাকবে সারাক্ষণ,
ভাবতো যদি এমন হতো।
আমার কথা সবার কাছে থাকবে পরিস্ফুট
আমায় নিয়ে থাকবে তারা সুখে অবিরত।
অবশেষে
ঈশ্বরকে বলি, আমার ইচ্ছে হয় যেন মঞ্জুর।

মাধবীলতা

মধুমিতা নস্কর
দ্বিতীয় বর্ষ

বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ মেখে চলতে থাকি
জল টুপটাপ পায়ে।
পুঁইমাচা থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টিতে ময়ূরের ডানা
আঁকতে থাকি আলুকশির গায়ে।
রক্তবর্ণ তেলাকুচো ফলের লোভে ছুটে আসে
বুলবুলি অদ্ভুত অমোঘ আকর্ষণে।
আমার দুর্নিবীর বেদনা ঘূর্ণি ঝড়ে ঘুরতে ঘুরতে
ডুকরে কেঁদে ওঠে শিরিষের ডালে।
কচুরিপানা থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে একবিন্দু
জস। আমার পলকহীন দৃষ্টিতে,
অবাধ্য শরীর এলিয়ে পড়ে ফলন্ত যবের
শিষের অগ্রভাগে।
মাধবীলতা অবিরাম গান গেয়ে যায় আলুক -
শালুকের সাথে শেফালি বনের মাঠে,
প্রেম মৃদু সৌরভ ছড়াতে থাকে, রোদ্দুরের
আনাচে কানাচে আর পুকুরের ঘাটে।
বেনের মেয়ে কলসী কাঁখে তপস্বীকে জল
দেয়। করে যতন।
গোধূলী বেলার রক্তিম সূর্য যেন আজ
সিঁদুর কৌটো আমের মতন।
মাধবীলতার শুভ্র পাপড়ি কোঁচড়ে কোড়ায়
চাতকী
পাড়া গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরে উষাকালে জন্ম নেয়
মাধবীলতা জাতকী।

রীনা ইয়াসমিন
প্রথম বর্ষ, দর্শন (অনার্স)
রোল নং - ২২৪

সাহানি পারভীন
দ্বিতীয় বর্ষ, ভূগোল (অনার্স)
রোল নং - ৯

পায়েল মন্ডল
প্রথম বর্ষ, দর্শন (অনার্স)
রোল নং - ১৫৭

মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

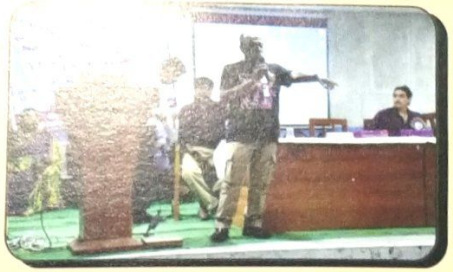

জনসংযোগ ও চিত্র সাংবাদিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা

আলোচনা সভা - বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় সেবা প্রকল্প ঃ সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা

আলোচনা সভা - পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক

সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত আলোচনা সভা

রক্তদান উৎসবে এন.সি.সি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী